

বোতল ভূত

হুমায়ূন আহমেদ



আমাদের ক্লাসে মুনির ছেলেরা একটু অদ্ভুত ধরনের। কারো সঙ্গে কথা বলে না। সব সময় পেছনের বেঞ্চিতে বসে। ক্লাসের সারাটা সময় জানালা নিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। স্যার কিছু জিজ্ঞেস করলে চোখ পিটপিট করতে থাকে। তখন তার মুখ দেখে মনে হয়, সে স্যারের একটি কথাও বুঝতে পারছে না।

মুনিরের এই স্বভাব স্কুলের সব স্যাররা জানেন। কাজেই কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন না। শুধু আমাদের অঙ্ক স্যার মাঝে-মাঝে ফেঁপে গিয়ে বলেন, 'কথা বলে না। ঢং ধরেছে। চার নব্বুরী বেত দিয়ে আচ্ছা করে পেটালে ফড়ফড় করে কথা বলবে।'

আমাদের স্কুলের কমন রুমে নব্বুর দেয়া নানান রকমের বেত আছে। বেত যত চিকন তার নব্বুর তত বেশি। চার নব্বুরী বেত খুব চিকন বেত। এক নব্বুরী বেত সবচেয়ে মোটা।

কথায় কথায় বেতের কথা তুললেও অঙ্ক স্যার কখনো বেত হাতে নেন না। কিছু এক-এক দিন মুনিরের উপর অসম্ভব রাগ করেন। যেমন আজ করেছেন। রাগে তাঁর শরীর কাঁপছে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে।

স্যার চৌবাচ্চার একটা অঙ্ক করতে দিয়েছেন। জটিল অঙ্ক। একটা পাইপ দিয়ে পানি আসছে। একটা ফুটো দিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর ফুটো বন্ধ করে দেয়া হল--এই সব হাবিজাবি। মুনির ফট করে অঙ্কটা করে ফেলল। আমি মুনিরের পাশে বসেছি, কাজেই ওর খাতা দেখে আমিও করে ফেললাম। অঙ্ক হয়ে গেলে হাত উঁচু করে বসে থাকতে

হয়, কাজেই হাত উঠু করেছি। আর কেউ হাত তুলছে না। তোলার কথাও না--খুব ভয়ানক অন্ধ। এখন একটা সমস্যা দেখা গেল। কেউ যদি হাত না তোলে তাহলে অন্ধ স্যার আমাদের বলবেন বোর্ডে এসে অন্ধটা করে নিজে। বিরাট সমস্যা হবে। আমি চুট করে হাত নামিয়ে ফেললাম। অন্ধ স্যার হুকোর সিলেন, 'হাত তুলে নামিয়ে ফেললি কেন? অন্ধ হয় নাই।'

'ছি না স্যার।'

'সেখি খাতা নিয়ে আর।'

খাতা নিয়ে গেলাম। স্যার খাতা সেখে গভীর গলায় বললেন, 'এই তো হয়েছে। হাত নামালি কেন? সত্যি কথা বল, নয় তো পাঁচ নম্বরী বেত নিয়ে কেরামতি সেখিয়ে দেব।'

আমি চুপ করে রইলাম। এই শীতোৎসাহ ঘাম বেরিয়ে গেল। বুক ভকিয়ে কাঠ।

বশির বলে একটা ছেলে আছে আমাদের ক্লাসে। খুব বজ্জাত। তার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে বিপদে ফেলা। যদি কোনো স্যার বেত আনতে বলেন--বশির আনলে ছেলে ফেলে। কিন্নয়ে বলে দিয়ে বলে, 'স্যার আমি নিয়ে আসি।'

যদি কোনো ছেলেকে নীলচাউন করে রাখা হয়, বশিরের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে--সে বড় মজা পায়।

আজও তাই হল। যেই সে দেখল অন্ধ স্যার পাঁচ নম্বরী বেতের কথা বললেন, ওটি সে বলল, 'ও স্যার মুনিরের খাতা থেকে টুকলিছাই করেছে। আমি দেখেছি।'

স্যারের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। বশির দাঁত বের করে বলল, 'বেত নিয়ে আসি স্যার।'

'হা নিয়ে আর।'

'কর নব্বয় আনব স্যার।'

'পাঁচ নম্বরী আন। সেখ আজ কেরামতি কাকে বলে।'

বশির লাফাতে লাফাতে বেত আনতে গেল। অন্ধ স্যার মুনিরকে

জিগ্মেস করলেন, 'হুমায়ূন তোর খাতা থেকে টুকিয়ে?'

মুনির তার স্বভাবমতো চুপ করে রইল। হ্যাঁ না কিছুই বলল না।
মুনির ক্লাসে কখনো কথা বলে না।

'কথা বল, নয়তো আজ তোর কেরামতিও বের করব। ব্যাটা যৌন
বাবাজী, কথা বলে না। কথা বল! নয়তো তোর একদিন কি আমার
একদিন।'

মুনির উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। ততক্ষণে বশির

'কয় নফর আনব স্যার?'



চলে এসেছে। আনন্দে সে কলকল করেছে।

অঙ্ক স্যার পতীর গলায় বললেন, 'দু' জনই পচিশ ঘা করে বেত বাধি। কত ধানে কত চাল বেত হয়ে যাবে। ক্রাস সিন্ধে বাড়ি, এর মধ্যেই বাত্যা সেখে সেখা গিখে গেছে। মামসোবাজি! আরেক জন সরবেশ মৌনী বাবা। সেবি হাত পাত। দুই হাত।'

আমি হাত পাতলাম। বশির আনন্দে ফিক করে হেসে ফেলল। আমি অবশি খুব ব্যথা পেলাম না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখলে আর হাত শক্ত করে রাখলে বেশি ব্যথা লাগত। আমি ঘনঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম আর হাত খুব নরম করে ফেললাম।

মুনিরের কোনো শাস্তি হল না। হবে না আমি জানতাম। কারণ ও খুব ভালো ছেলে। গভারের ইংরেজি কি তা সে চট করে বলে নিতে পারবে। শুদ্ধ বানানে। অবশি মুখে বলবে না। খাতায় লিখে সেবে। ওর একটাই দোষ--কথা বলে না। এই দোষের জন্যই তার শাস্তি হয় না।

অঙ্ক স্যার একটা বক্তৃতা দিলেন, যার সারমর্ম হচ্ছে শারীরিক শক্তির তিনি খোর বিপক্ষে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দিলেন, কারণ অপরাধ তুলনায়। কমার অযোগ্য। এই বয়সে যে টুকলিফাই করে, বড় হয়ে সে কী করবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আমার নিজের জায়গায় ফিরে যেতেই বশির ডিকন গলায় বলল, 'পচিশ ঘা বেত দেয়ার কথা স্যার, আপনি মাত্র তেরটা দিয়েছেন। বারটা বাকি রইল স্যার।'

বশিরটা এমন বজ্জাত। রাগে আমার গা জ্বলতে লাগল। কিন্তু কিছু করার নেই। হজম করতে হবে। সুযোগমতো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটবলের মাঠে বেকারলা ল্যাং মেরে ফেলে দিতে হবে। কিংবা লাল শিশড়ার বাসা মাথায় টুপি মতো পরিয়ে দিতে হবে।

আমাকে শাস্তি দিলে অঙ্ক স্যারের বোধ হয় মনটা খারাপ হয়েছিল। কারণ তিনি সেখি মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে আছেন। অন্য সময় হলে এককণ বোর্ডে চলে যেতেন এবং কড়ের মতো একটির পর একটি অঙ্ক করতে থাকতেন। আমাদেরও নিঃশ্বাস ফেলার সময় থাকত না।

টপটপ বাতাস তুলতে হত। আজ সে রকম কিছু হচ্ছে না। স্যার আড়ো-
আড়ো তাকাচ্ছেন আমার দিকে। চিবকার ঠোঁটামেটি করলেও স্যারের
মনটা খুব সরম। কোনো ছেলের অসুখ হয়েছে তখনে তিনি তার বাসায়
যাবেন। বাজখীই বলার বলবেন, 'কী যে হুশা করিস, আবার অসুখ
বাম্বালি। তাড়াতাড়ি ভালো হ। নয়তো চড় নিয়ে দাঁত ফেলে দেব।'

মুনির এখনো দাঁড়িয়ে। শান্তির অপেক্ষা করছে। বেশ ভরও পেয়েছে।
অর অর কীপছে। অর স্যার বললেন, 'তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন,
বস।'

মুনির বসল। আড়চোখে কয়েকবার তাকাল আমার দিকে। তারপর
ইঠাৎ আমাকে অবাক করে নিয়ে বলল, 'এই হুমায়ুন, তুত পুৰবি।'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বলে কি। তুত পুৰবি মানে? তুত কি
কুকুরছানা নাকি?

মুনির ফিসফিস করে বলল, 'আমি আজ সন্ধ্যায় একটা তুতের
বাক্স আনতে যাব।'

'তুতের বাক্স আনতে যাবি মানে। তুতের বাক্স পাওয়া যায়
নাকি?'

'এক জন আজ আমাকে একটা তুতের বাক্স দেবে। সন্ধ্যায় সময়
যেতে বলেছে। তুই বাবি?'

আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। মুনিরটা এমন আগ্রহ করে
তাকাচ্ছে। আমার মার খাওয়া দেখে হয়ত তার মায়ো লেপেছে। একস
আমাকে খুশি করতে চায়।

'হুমায়ুন বাবি?'

'যাব।'

'খবরদার কাটকে বলবি না।'

'আচ্ছা বলব না।'

কোনো কথা কাটকে না বলে থাকা কঠোর ব্যাপার। তখন কথাটা
পেটের মধ্যে বড় হতে থাকে। পেট গুরগুর করে। খুব অস্বস্তি হয়। এই
অন্য কোনো কথা বেশিক্ষণ পেটে রাখতে নেই। খুব গোপনীয়

কথাগুলি বটগাছকে বলে পেটে হালকা করতে হয়। বটগাছ সেই কথা
কাটিকে বলতে পারে না বলে আর কেউ জানতে পারে না।

চুল চুটির পর আমরা রওনা হলাম। তুঙ্গপুত্রের পাড় ঘরে-ঘরে
অনেক দূর যেতে হল। কেওটখলির কাছাকাছি এসে নদী পার হলাম।
নীতকাল, কাজেই পানি বেশি নেই। খেয়া-নৌকা আছে। দশ পয়সা
করে নেয়। যুনির পয়সা নিয়ে নিল। সন্ধ্যা এখনো হয় নি। এর মধ্যে
চায়নিং অস্তকর। বাছপালায় ভেতর নিয়ে যাচ্ছি। এক সময় নোতলা
একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাছপালায় ঢাকা জকুলে জায়গায়
শ্যাওলা-ঢাকা এক বাড়ি। লোহার পেট। সেই পেটে বাড়ির নাম
লেখা— “শান্তিনিকেতন”। আমি ভয়ে-ভয়ে বললাম, ‘কোথায় নিয়ে
এসি? এটা কার বাড়ি?’

‘আমার এক আত্মীয়-বাড়ি। দূর সম্পর্কের নানা হয়।’

‘এই লোকই তোকে তুতের বাচ্চা নেবে?’

‘হুঁ।’

‘কল ছেড়েছে।’

‘না, কল ছাড়ো নি।’

‘কি করে বুঝলি কল ছাড়ো নি?’

‘চেহারা দেখলে তুইও বুঝবি। সন্ধ্যাসীর মতো চেহারা। সন্ধ্যাসীরা
কি কল ছাড়ো?’

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা ধাক্কাবার পর যিনি সন্ধ্যা খুললেন, তাকে দেখে
আমি অবাক। অবিকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠিক সে রকম লম্বা দাড়ি।
সাদা বাবড়ি চুল। লম্বা এক জন মানুষ। পরনে আলখাত্তার মতো লম্বা
একটা পোশাক। গলার স্বরও কী গভীর!

‘দাঁড়িয়ে আছিস কেন, ভেতরে আর। সঙ্গে এটি কে?’

‘আমার বন্ধু। এও তুতের বাচ্চা নেবে।’

‘আমি কি সোকান দিয়ে বসেছি নাকি, যে-ই আসবে একটা করে
তুতের বাচ্চা নিয়ে সেব? একটা সেব বলেছিলাম, একটা পাবি। ভেতরে
এসে বস।’

আমরা সিঁড়ি ভেঙে সোতলার একটা ঘরে ঢুকলাম। সেই ঘরে বই ছাড়া আর কিছুই নেই। মেঝে থেকে ছান পর্যন্ত শুধু বই আর বই। মাঝখানে একটা ইজিচেয়ার ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। ইজিচেয়ারের পাশে ছোট্ট একটা টেবিল। টেবিলে একটা অদ্ভুত ধরনের টেবিল ল্যাম্প। উনি বোধ হয় এখানে বসেই বই পড়ছিলেন।

‘তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বস। মেঝেতে পা ছড়িয়ে বস। নাকি মেঝেতে বসলে তোদের ছান বাবে?’

আমরা পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসে পড়লাম। আমার একটু ভয়ভয় করছে।

‘কিছু খাবি তোরা?’

‘ব্বি না।’

‘ভূতের বাক্য যে মিথি, কোনো পাত্রে এনেছিস?’

মুনির না-সূচক মাথা নাড়ল।



ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কিছু নিয়ে আসিস নি, তাহলে মিথি কী করে? পকেটে করে তো আর নিতে পারবি না। হুত হচ্ছে হাতয়ার তৈরি। আশ্চর্য দেখি ঘরে কিছু আছে কিনা।'

তিনি আমাদের বসিয়ে রেখে চলে গেলেন। বুধতে পারছি বাড়িটা অনেক বড়। অনেকগুলি ঘর। কিছু এই ঘরটি ছাড়া অন্য কোনো ঘরে বাড়ি ফুলছে না। লোকজনেরও কোনো সাদা নেই। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না?'

'না।'

'ওর নাম কি?'

'আগে অন্য নাম ছিল। এখন ওকে রবিবাবু বলে ডাকতে হয়। রবি-বাবু না ডাকলে রাগ করেন। আমি ভাবি রবি নানা।'

'উনি করেন কি?'

'কিছু করেন না। শুধু বই পড়েন আর কবিতা লেখেন।'

'কবিতা লেখেন কেন?'

'নোবেল প্রাইজ দরকার তো, এই জন্যে কবিতা লেখেন। কবিতা না লিখলে নোবেল প্রাইজ পাওয়া যায় না। হুই আর কথা বলিস না তো। চুপ করে থাক। বেশি কথা বললে উনি রাগ করেন।'

আমি চুপ করে গেলাম। ভদ্রলোক ঢুকলেন হাতে ছোট্ট একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের পিপি নিয়ে। হুতের বাচ্চা কি উনি এর মধ্যে তত্ত্ব সেবেন? কী সর্বনাশ।

'বোতল একটা পাওয়া গেছে, পরম পানিতে ধুতে হবে। সময় পাশবে।'

আমি কিছু বলব না বলব না করতেও বলে ফেললাম, 'এত ছোট বোতলের মধ্যে থাকবে?'

আমার কথায় ভদ্রলোক অত্যন্ত রেগে গেলেন। চোখ বড়বড় করে বললেন, 'ছোট্ট একটা কলসির মধ্যে যদি বিশাল নৈতা থাকতে পারে, হোমিওপ্যাথির পিপির মধ্যে হুতের বাচ্চা থাকতে পারবে না?'

আমি কিছু বললাম না। ভদ্রলোক ধমকের সুরে বললেন, 'জবাব

নাও--পারবে কি পারবে না?

'পারবে।'

'হঁ, ল্যাটিস কত। কী নাম তোমার?'

'হুমায়ুন।'

'ক্লাস নিয়ে পড়?'

'হি।'

'হোল নাচার কত?'

'বত্রিশ।'

'ক্লাসে হাত কত জন?'

'বত্রিশ।'

'তার মানে পড়াশোনা কিছুই পার না?'

'হি না।'

'কুল ভালো লাগে না?'

'হি না।'

'রবি ঠাকুরেরও কুল ভালো লাগত না। তাই বলে তুমি মনে করো না যে তুমি রবি ঠাকুর।'

'আমি মনে করি না।'

'কত। এখন বল তো আমার চেহারাটা রবি ঠাকুরের মতো না?'

'হি।'

'মুশকিল হচ্ছে কি জান? টাক পড়ে যাচ্ছে। টাকওয়ালা রবীন্দ্রনাথ অসহ্য, তাই না?'

আমরা কিছু বললাম না। ভদ্রলোক আমাদের রোখে হেঁমিওপ্যাথির শিলি হাতে নিয়ে উদ্ভাও হয়ে গেলেন। আমি মুন্সিরকে বললাম, 'তোমার এই নানা কি পাগল?'

'না, পাগল হবে কেন?'

'কেমন কেমন করে বেল তাকাচ্ছে।'

মুন্সির কি একটা বলতে গিয়েও খেমে গেল, কারণ ভদ্রলোক আবার এসে ঢুকেছেন। হেঁমিওপ্যাথি তবুকের শিলিতে হলুদ রঙের

বোঁচাটে কি একটা জিনিস।

‘সাবধানে রাখবি। মুখ গলা নিয়ে সীল করে রেখেছি। খবরসার, সীল ভাঙবি না। মাঝে মাঝে চীনের আলোতে রাখবি। এরা চীনের আলো খায়। ত্রুক্ষপুত্রের পাত্ৰ নিয়ে বোতল হাতে নিয়ে হাঁটবি। এরা টাটকা বাতাস পছন্দ করে।’

আমি বললাম, ‘বোতলের ভেতর তো বাতাস যাবে না।’

ভক্তলোক কড়া গলায় বললেন, ‘এই ছেলে তো বেশি কথা বলে। পোন ছোকরা, কথা কম বলবে।’

‘হুি আচ্ছা।’

‘এখন বাড়ি চলে যাও। ফাবার আগে একটা কবিতা শুনে যাও। টাটকা কবিতা। আজ বিকেলে লিখেছি। দু’ ঘন্টা মতো হয়েছে। এখনো বাসি হয় নি। ছ’ ঘন্টার আগে কবিতা বাসি হয় না। শুধু পরম্ব কালে তিন ঘন্টারেই বাসি হয়।’

আমরা ছুপচাপ বসে আছি। ছবি নানা পকেটে হাত নিয়ে কবিতা লেখা কার্ণক বের করলেন। মাঝা দুনিয়া পড়তে শুরু করলেন,

‘আমাদের ছোটিন্দী চলে বীকে বীকে

বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

পার হয়ে যায় পর

পার হয় বাড়ি।

দুই ধার উই তার।

চালু তার বাড়ি।’

কবিতাটা আমার বেশ ভালো লাগল। তবে কেন জানি মনে হতে লাগল আগেও পড়েছি।

‘কবিতাটা কেমন?’

‘খুবই ভালো।’

‘ত্রুক্ষপুত্র নিয়ে লেখা। আচ্ছা, যাও এখন, বাড়ি যাও। রাত হয়ে যাচ্ছে।’

ছুতের বাচ্চা নিয়ে আমরা চলে এলাম। আমার বারবার মনে হতে

লাগল এটা সত্যি নয়। কোথাও মগ্ন একটা ছাঁকি আছে। মুনিরের একটা হাত পকেটে। সেই হাতে সে নিশ্চয়ই বোতল ধরে আছে। একবার সে খীণ গলায় বলল, 'কেমন জানি পরম-পরম লাগছে।'

ব্রহ্মপুত্রের পাশ দিয়ে আসছি। নদীর উপর খীণ ঢানের আলো। আমাদের কেন জানি বেশ ভয়ভয় করতে লাগল। মুনির ফিসফিস করে বলল, 'বোতলটার ভেতর ঐটা নড়াচড়া করছে রে।'

'ভয় লাগছে?'

'হুঁ।'

'আমার কাছে নিয়ে সে। সকালবেলা নিয়ে নিবি। দিনের আলোয় আর ভয় লাগবে না।'

মুনির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে শিশিটা নিয়ে নিল। প্যাণ্টের পকেটে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণ পর পকেটে হাত নিয়ে সেখি সত্যি সত্যি একটু ফেন পরম পরম লাগছে।

বাসায় এসে ততাবহ দুঃসংবাদ শুনলাম। অঙ্ক স্যার নাকি সন্ধ্যার পর এসেছিলেন। আমি এখনো ফিরি নি শুনে খুব রেগে গেছেন। বলে গেছেন আবার আসবেন।

অঙ্ক স্যারের এই হচ্ছে একটা বদ অভ্যাস। হঠাৎ হঠাৎ সন্ধ্যার পর ছাত্রদের বাড়িতে উপস্থিত হন। বাজখাঁই গলায় বলেন, 'কি, পড়াশোনা হচ্ছে কেমন? সেখি প্রতিপত্তিটা আন তো।'



আমাদের বাড়িটা বেশ অন্ধুত।

এই বাড়িতে দু' দল মানুষ থাকে। ছোট আর বড়। ঘ্যাটিক ক্লাসের নিচে যারা তারা সবাই ছোট। আর ঘ্যাটিক ক্লাসের উপরে হলোই বড়।

হাত ঘুরনা ছোটদের। সন্ধ্যা হতে-না-হতেই তাদের পড়তে বসতে হবে। পড়তে হবে চেঁচিয়ে, যাতে সবাই শুনতে পায়। পড়ার সময় বড়রা কেউ-না-কেউ থাকবেই। এদের একটামাত্র কাজ--একটু পরপর বমক দেয়া।

এ বাড়ির ছোটদের মধ্যে আমি এবং আমার দুই ছোট ভাই। এরা বেশি ছোট। এক জন দুতে পড়ে। অন্যজন হারে অ হারে আ করে আর বইয়ের পাতা ছেঁড়ে। বড়দের সঙ্গে আছে বাবা, মা, আমার বড়চাচা এবং বড়চাচার মেয়ে অরু আপা। অরু আপা কিছুদিন আগেও ছোটদের সঙ্গে ছিল। ম্যাটিক পাশ করায় এখন বড়দের সঙ্গে চলে গেছে। ফার্সি ডিগ্রিশন আর চারটা সেটির পাওয়ায় খুব সেমাগ হয়েছে।

আজ পড়া দেখিয়ে নিচ্ছে অরু আপা। রোজ সন্ধ্যায় সে বানিকফণ আমাদের পড়া দেখিয়ে দেয়। অরু আপা এদ্রিতে খুব ভালো মেয়ে--হাসিখুশি, কিছু পড়া দেখাতে গেলেই সে কেমন জন্নি হয়ে যায়। খুব কঠিন, গলার স্বর কমঝমে আর এমন ভাবে ভাঙায়, যেন একুনি এসে আমাকে কামড় দেবে। আজ পড়ছি জলবায়ু। অরু আপা বলল, 'মৌসুমী বায়ু কাকে বলে?' আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'ঠান্ডা এবং মোলায়েম বায়ুকে মৌসুমী বায়ু বলে। এই বায়ু গায়ে লাগলে খুব আরাম। তবে বেশি লাগলে সর্দি হবার সম্ভাবনা। ঘরনের টনসিলের দোষ আছে তাদের মৌসুমী বায়ু গায়ে লাগান উচিত নয়।'

অরু আপা হাত উচিয়ে বলল, 'একটা চড় দেব।'

'আমাকে চড় দিলে তুমিও বামডি হবে।'

'ফাজিল।'

'তুমিও মহিলা ফাজিল।'

অরু আপা রাগে কিড়মিড় করতে করতে সত্যি একটা চড় বসিয়ে নিল। আমিও বামডি দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, ঠিক তখনই বাবা এসে বললেন, 'এই হুমায়ুন তুই বাইরে আর। তোর স্যার এসেছে--অঙ্ক স্যার।'

আমার মনটা ব্যস্ত হয়ে গেল। অঙ্ক আপাতকৈ খামটি দেয়া গেল না। তার উপর আমার অঙ্ক স্যার এসে বসে আছেন। পড়া ধরবেন কিনা কে জানে।

‘সন্ধ্যাবেলা কোথায় ছিলি?’

অঙ্ক স্যার মেঘগর্জন করলেন। আমি চুপ করে রইলাম। কোনো কথা না বলাই এখন নিরাপদ।

‘আমাকে চড় দিলে তুমিও খামটি দাবে।’



‘সঠি কথা বল। মিথ্যা বললে তোকে পুঁতে ফেলব। বেয়াসপের
বাড়। সম্ভাবেনা ঘুরে বেড়ান। বল, কোথায় ছিলি?’

আমি আমতা-আমতা করে বললাম, ‘ভূতের বাচ্চা আনতে
গিয়েছিলাম স্যার।’

‘কী বললি।’

‘এক জনের কাছ থেকে একটা ভূতের বাচ্চা আনতে
গিয়েছিলাম।’

‘এনেছিস?’

‘ছি।’

‘কোথায়?’

‘আমার পকেটে স্যার।’

আজ স্যার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর নাক ফুলে-ফুলে
উঠতে লাগল। তীব্র রঙে গলে স্যারের এ রকম হয়। আমি খুব
ঘামতে লাগলাম। না জানি কী হয়।

‘ভূতের বাচ্চা আনতে গিয়েছিলি?’

‘ছি স্যার।’

‘কোথায় সেই ভূতের বাচ্চা?’

‘পকেটে স্যার। প্যাণ্টের পকেটে।’

‘বের কর।’

আমি বের করলাম। যেটো হোমিওপ্যাথির শিশি, খাল্য নিয়ে মুখ
বন্ধ করা। তেতরে খোঁচাটে একটা কিছু।

‘এই তোমার ভূতের বাচ্চা?’

‘ছি স্যার।’

‘আজ আর কিছু বললাম না। এই সব আজেকবাজে জিনিস বিশ্বাস
করার জন্যে কাল কঠিন শাস্তি হবে। কাল তুই তোমার ভূতের বাচ্চা নিয়ে
ফুলে আসবি। দেখবি পাঁচ নবুদী বেতের কেরামতি।’

আমি হীণ ছেড়ে বীচলাম। কাল বা হবার হোক, আজ রাতটায়
তো নিজার পাওয়া গেল। এই বা কয় কি?

ভুতের কথা শুনে বাড়িতে একটা মৈত্রে পড়ে গেল। সবাই ভুতের বাচ্চা হাতে নিয়ে সেখানে চায়। সেখানে চাইলেই তো হাতে দেয়া যায় না। হয়তো ফট করে হাত থেকে ফেল দেবে।

একমাত্র অরু আপাই ভুতের ব্যাপারে কোনো অগ্রহ দেখাল না। অরু আপা সায়েলে পড়ে। যারা সায়েলে পড়ে তাদেরকে সব কিছুই অবিশ্বাস করতে হয়। কাজেই সে ঠেটি উণ্টে বলল, 'ভুত না ছাই। বানিকটা ধোঁয়া বোতলে ভরে নিয়ে নিয়েছে। নীল রঙের ধোঁয়া।'

নীল রঙের ধোঁয়া শুনে আমার খটকা লাগল। ব্যাপারটা কী, নীল রঙের ধোঁয়া বলছে কেন? আমি তো একটু আগে দেখলাম হলুদ।

ও মা, কী কান্ড! বোতল হাতে নিয়ে একেক জন একেক রঙ বলতে লাগল।

বড়চাচাও অবাক হয়ে গেলেন। চোখে চশমা পরে অনেকক্ষণ হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-কিরিয়ে দেখলেন। পরীর হয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা রহস্যজনক। আমি খয়েরী রঙ দেখতে পাচ্ছি। এর মানেটা কি?'

বড়চাচার কথায় সবার গা হুমহুম করতে লাগল। আমার দাদী কোঁদে উঠলেন, 'কী অলঙ্ঘন্য কান্ড! ভুতের বাচ্চা ধরে নিয়ে এসেছে। এই হুমাহূম, যা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে অরু। তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ কি? এই ছেলেকে গরম পানি দিয়ে গোসল করাও। লবণ খাওয়াও।'

অনেক রাতে বড়দের একটা মিটিং বসল। আমার বাবা বললেন, 'ব্যাপারটা বোকা যাচ্ছে না। তবে একেক জন যে একেক রকম রঙ দেখছে এটা সত্যি।'

ছোটচাচা বললেন, 'ঘোড়ার ডিমটা রাস্তায় নিয়ে ফেলে নিলে কামেলা হুকে যায়।'

বড়চাচা তাতে রাজি না। তিনি আরো পরীক্ষা করতে চান। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল রাতের বেলা বোতলটা সিন্দুকে ডালাচাবি নিয়ে রাখা হবে। আগামী কাল যা করার করা হবে। বিশেষ করে ভুতের অরু স্যার যখন বলেছেন বোতল ফুলে নিয়ে যেতে--সেটাই করা হোক।

পরদিন আমি বোতলটা ফুলে নিয়ে গেলাম। ও মা! সবাই সেখান

এই খবর জানে। তুই ক্রাসের ছেলেরা শব্দই হার নিজে বুঝে সেখানের উদ্দেশ্য।
আমাদের ক্রাস-ক্যাশটিন ফিল্ডফিস করে বলল, 'আমাকে একবার যদি
হাতের নিচের সিন্স ক্রাসের আর কোচের সিন্স বোয়ার্টে হোম নাম লিখব না।'

আর স্যার ক্রাস ক্রাসের বোর নিজে। তিন নকুটী এবং পাঁচ নকুটী
বোর। আমাকে বর্নিত হোসে ফেলল। ক্রাসের শব্দই সেটা হবে সেরে
সেলেই বর্নিতের বড় আমল হয়। সে পাঁচ বোর করে বলল, 'আর না
হয় হবে। হুমায়ুনকে স্যার টাইট সেবে।' সে ছাত্র সেবার ক্রাসে আমের
কালে এসে বলল।

আর স্যার হুমায়ুনকে ফিল্ডফিস, 'হুমায়ুন, এসেফিস।'

'হু স্যার।'

'হু এসেফিস।'

'হু স্যার।'

'বোর কর, সবাইকে সেবা।'

'সবাই সেবেছে স্যার।'

'কর। এখন এই ক্রাসে ক্রাস ক্রাসে বিশ্বাস করে যে এর কোচের
সবাই একটা ক্রাসের ক্রাসে আছে। হার বোল।'

আমার সেবারেই আমের সল-হার জল হাত ফুলল।

স্যার বললেন, 'কী ক্রাসে বিশ্বাস হয় যে এর কোচের সবাই ক্রাস
আছে।'

আমাদের ক্রাস-ক্যাশটিন বলল, 'একেক জন একেক ক্রাসে হার
সেবে স্যার।'

'হাই নকি।'

'হু স্যার। আমি সেবেই সবুজ হার, আর হারিন সেবেছে লাল।'

আর স্যার স্যার ক্রাসের বললেন, 'আমের লাল সল, হোম যে
ক্রাসের সার্ট শব্দফিস বোমলে সেই হার সেবারে শব্দফিস। হারিনের ক্রাসে
লাল সুয়েলিট, এই ক্রাসে সে সেবেছে লাল। আমেরে ডিট্রিৎ, ফীক।
ক্রাসেরে ফীক। কি, বিশ্বাস হয়।'

আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ব্যাপারটা আসলেই তাই। আমি হলুদ
লেখছি, কারণ আমার স্যুটেজিরটির রঙ হলুদ। অহ স্যার মেমবার্ন
করলেন, 'যত বেকুবের দল, সহজ জিনিস বোঝে না। এখন মন নিজে
শোন, এই বোতলে যা আছে তা আমি গিলে ফেলব।'

আমরা অবাক হয়ে তাকালাম। স্যার বলে কী। গিলে ফেলবে মানে।
স্যার গম্ভীর মুখে বললেন, 'গিলে ফেলে ভোনের বোঝার যে আসলে
কিছু না। হাতেনাতে না দেখলে ভোনের জ্ঞান হবে না। খাবার দল।
কুস-ক্যাপ্টেন ভোখায়।'

'এই যে স্যার।'

'হা এক কুস পানি নিজে আয়। পানি নিজে গিলব।'

কুস-ক্যাপ্টেন ছুটে গেল পানি আনতে। বশির বলল, 'হুম্মুনকে
পানি দেবেন না স্যার? ওর পানি পাওয়া দরকার। সবাইকে বোকা

—স্যার বোতলের মুখ বুজে নিজের
মুখে ঠপুড় করে ধরলেন।



বানিজ্যে:

‘হবে, শান্তি হবে। আগে তুতটা গিলে ফেলি, তারপর শান্তি।’

পানি এসে গেল। অঙ্ক স্যার ছোট্ট একটা বস্তুতা নিলেন-- ‘লেশটা কুসংজ্ঞায়ে ছুবে আছে। এক জন হোমিওপ্যাথির শিলিতে তুতের বাচ্চা ভরে এনেছে। অন্য সবাই তাই বিশ্বাস করছে। হিঃ হিঃ!’

বলতে বলতে স্যার বোতলের মুখ খুলে নিজের মুখে উপুড় করে ধরলেন। এক গ্লাস পানি খেয়ে বললেন, ‘গিলে ফেললাম। হল এখন? তুতের বাচ্চা হজম।’

স্যার একটা তুতির ঢেঁকুর তুললেন। আমরা অবাক হয়ে স্যারের নিকে তাকিয়ে আছি। স্যার কী একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন এবং আবার একটা ঢেঁকুর তুললেন। তারপর আবার একটা।

আমরা মনে হল স্যার কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। বানিজ্যিক লেটে হাত বোলালেন। বোতলটা খঁকে সেখলেন। এবং আবার বেশ বড় রকমের একটা ঢেঁকুর তুললেন। মনে হল তিনি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন।

বশির বলল, ‘স্যার হুমায়ূনের শান্তি নিলেন না?’

স্যার সেই কথা যেন শুনতেও গেলেন না। কিম ধরে চেয়ারে বসে রইলেন এবং একটু পরপর ঢেঁকুর তুলতে লাগলেন। সেদিন আর ক্লাসে কোনো অঙ্ক করা হল না।



সূর্য জোবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বই নিয়ে বসার কথা। এটা হচ্ছে বড়চাচার কঠিন নিয়ম। তবে সব নিয়মেরই ফাঁক আছে। এই নিয়মের কোনোতেও তা সত্যি। মাঝে মাঝে সম্ভাবনা বড়চাচা রাজনীতি নিয়ে

আলাপ করবার জন্যে পাশের উকিল সাহেবের বাড়ি যান। সেই বাড়িতে যাওয়া মানে পাক্কা তিন ঘণ্টার ধাক্কা। ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। ঐ সব দিনগুলিতে সূর্য জোবার সঙ্গে সঙ্গে বই নিয়ে বসার নরকার নেই। কিছুকণ খেলাখুলা করা যায়। আমরা ছোট্টা বড়চাচা ছাড়া কাউকে ভয় করি না। আমার ধারণা সব বাড়িতে এ রকম এক—আম জন মানুষ থাকে যানের সবাই ভয় করে, অন্যদের পাক্কাই দেয় না।

যাই হোক, বড়চাচা বাসার নেই—উকিল সাহেবের বাসার গেছেন, আর আমরা নতুন একটা খেলা বের করেছি। এই খেলার নাম— 'পানি খেলা'। সবাই মগে করে পানি নিয়ে এ ওর গায়ে ছিটিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। খুবই মজার খেলা।

খেলা যখন তুলে, তখন খবর পেলাম অঙ্ক স্যার এসেছেন। সব সময় দেখেছি দারুণ আনন্দের সময়ই ধরাপ ব্যাপারগুলি ঘটে। পৃথিবীটা এ রকম কেন কে জানে? পৃথিবীর নিয়মকানুনগুলি যখন করা হয়, তখন নিশ্চয়ই শিশুদের কথা কেউ ভাবে নি। আমার ধারণা এই পৃথিবীর সব নিয়মকানুনই হচ্ছে শিশুদের কষ্ট দেবার নিয়ম।

আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাইরে এসে দাঁড়িলাম। অঙ্ক স্যার বললেন, 'কী করছিলি?'

আমি অন্য দিকে তাকিয়ে বললাম, 'পড়ছিলাম স্যার।'

অঙ্ক স্যার বললেন, 'ভেরি গুড।' বলেই বিকট একটা টেকুর তুলে কীকাকশে হয়ে গেলেন। মনে হল বেশ লাজাও পেলেন। টেকুর কি ভূতের বাচ্চা গিলে ফেলার কারণে নাকি? হতেও পারে। গতকাল স্যার ক্রাসে আসেন নি। অঙ্ক স্যার ক্রাসে না আসার মানুষ না।

অঙ্ক স্যারকে কেমন রোগা রোগা লাগছে। মুখ শুকনো। জোখ লাল। মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে পারেন নি। গায়ে চান্দর জড়িয়ে ক্রান্ত ভঙ্গিতে বসে আছেন এবং একটু পরপর টেকুর তুলছেন। একে একে বার টেকুর ভোলেন আর হতাশ একটা ভঙ্গি করেন। কীকাকশে হাসি হাসেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেন।

'কেমন আছিস হুমায়ুন?'

‘ছি স্যার ভালো। আপনার শরীরটা কি স্যার ভালো না?’

‘উহ। গত রাত্রে ঘুম হয় নি।’

‘কেন স্যার?’

স্যার ইতস্তত করে বললেন, ‘না-মানে- ঐ দিন তোর বোতলের ঐ কিনিসটা গিলে ফেললাম, তারপর থেকে--মানে--’

‘তারপর থেকে কী স্যার?’

‘না, কিছু না। একটু পরপর টেকুর উঠছে। হুতের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই আমি জানি। শারীরিক কোনো অসুবিধা হয়েছে আর কি।’

‘ছি স্যার। ওষুধ খান, সেয়ে যাবে।’

‘খেয়েছি তো। নাকস ভমিকা এক ডোজ খেয়েছি। দুই শ’ পাওয়ার। কমছে না তো। মনে হচ্ছে, আরো যেন বেড়েছে।’

‘সত্যি নাকি স্যার?’

স্যার উত্তর না নিয়ে বড় রকমের একটা টেকুর তুললেন। সেই টেকুরের সঙ্গে পেটের ভেতরে বিচিত্র শব্দ হতে লাগল--‘টপ টপাটপ! কুম!! ওরু রুরুরু র!!!’ স্যার নিজেই সেই শব্দে বিচলিত। বিচলিত এবং হতভম্ব। তিনি টিকন গলার বললেন, ‘হুমায়ুন, যে লোক তোরকে হুতের বাচ্চা দিয়েছে তর কাছে আমাকে নিয়ে চল তো।’

‘কেন স্যার?’

‘এমনি। যাই একটু গল্প করে আসি। হুত-ফুত আমি বিশ্বাস করি না। হুতের কথা বলে তিনি যে বাচ্চাদের ভয় দেখাচ্ছেন, এটাও ঠিক না। বাসা চিনিস নে? আমাকে নিয়ে চল।’

‘মুনিরকেও সাথে নিয়ে যাই স্যার? মুনিরের সঙ্গেই তীর ভালো চেনা-জানা।’

‘মুনিরাসুদ্ধ লোক নিয়ে যাওয়ার কোনো দরকার দেখি না। দুই গেলেই হবে।’

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বুড়ো লোকটি দরজা খুললেন।

আমাদের নিকে এক পলক তাকিয়েই বললেন, 'এক মিনিট।' এই বলে পাশের ঘরের চলে গেলেন। খুটখুট শব্দ শোনা যেতে লাগল। যেন হামানদিতায় কিছু পিষছেন।

অঙ্ক স্যার ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'দেখতে অবিকল রবি ঠাকুরের মতো না?'

'হুঁ স্যার।'

'আমি তো চমকেই গিয়েছিলাম।'

'প্রথম দিন আমিও চমকে গিয়েছিলাম স্যার।'

'খুটখুট শব্দ হচ্ছে কিসের রে?'

'জানি না স্যার। হয়ত তৃতের তর্তা বানাচ্ছেন।'

'তৃতের তর্তা মানে? কী সব ছাগলের মতো কথা বললিস!'

বুড়ো ভদ্রলোক ফিরে এলেন। হাতে গ্রাস ভর্তি লালাত জিনিস। মুখ-ভর্তি হাসি। তিনি দরজা পলায় বললেন, 'গ্রাসে কী আছে অনুমান করতে পারবে? চিরতার পানি। স্বয়ং কবিগুরু খেতেন। আমিও খাই। তোমাদের দু' জনকেই তুমি করে বললাম। বয়সে দু'জনই আমার চেয়ে ছোট। ছোটটাকে তো তিনি, আমার কাছ থেকে তৃতের বাচ্চা নিয়ে গিয়েছিল। তুমি কে?'

স্যার কীপা পলায় বললেন, 'আমি হুমায়ূনের শিক্ষক। অঙ্ক স্যার।'

'বাহু খুব ভালো তো। অঙ্ক ব্যাপারটা আমারও খুব ভালো লাগে।'

আলস্য তুমি মনেমনে দুই সংখ্যার একটা অঙ্ক ভাব। ভেবেছ?'

অঙ্ক স্যার শুকনো গলায় ঠা-সূচক মাথা নাড়লেন।

'এর সঙ্গে সাত যোগ দাও। দিয়েছ?'

'হুঁ।'

'যোগ সেবার পর যা হয় তা তুমি ১১০ থেকে বাদ দাও। দিয়েছ?'

'হুঁ।'

'খুব ভালো। এর সঙ্গে পনের যোগ দাও।'

'সিলাম।'

'যে সংখ্যা মনে মনে ভেবেছ তাও এর সঙ্গে যোগ কর। করেছ?'

‘ছি কয়েছি।’

‘দুই নিয়ে তপ দাও। এর থেকে নয় বান দাও। যা থাকল তাকে তিন নিয়ে গুণ দাও। নিজে?’

‘ছি।’

‘তোমার উত্তর হল গিয়ে ১৫০--কি, হয়েছে?’

‘ছি, হয়েছে। আশ্চর্য তো!’

অঙ্ক স্যার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, ‘এই সর মজার মজার অঙ্ক করে ছাত্রদের কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে হয়। তা না, কঠিন কঠিন সব অঙ্ক নিয়ে তোমরা ছাত্রদের ভয় পাইয়ে দাও। অঙ্ক একটা মজার জিনিস, তোমরা সেই মজাটাই ছাত্রদের নিতে পার না। খুব খারাপ। এখন বল আমার কাছে কী চাও?’

অঙ্ক স্যার বললেন, ‘কিছু চাই না জনাব।’

বুড়ো খুব রেগে গেলেন। ধমকমে পলায় বললেন, ‘কিছু চাই না

‘কেন তুতের বাচ্চা গিললে?’



মানে? শুধু শুধু আমার সময় নষ্ট করতে এসেছ? অল একটু পরপর এমন বিলী ঢেকুর তুলছ কেন? কী হয়েছে?

অল স্যারের মুখটা কেমন কালো হয়ে গেল। আমার দিকে একবার করুণ চোখে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন।

আমি বললাম, 'আপনি যে আমাকে ভূতের বাচ্চাটা নিয়েছিলেন, অল স্যার সেটা পিলে ফেলেছেন। তারপর থেকে শুধু ঢেকুর উঠছে। স্যারের বড় কষ্ট।'

বুড়ো অবাক হয়ে বললেন, 'ভূতের বাচ্চা পিলে কেন? ভূত কি কোনো খাদ্যপ্ৰব? বল এটা কি কোনো মজানার কিছু?'

স্যার আমতা আমতা করছেন। জবাব নিচ্ছেন না।

'কি, চূপ করে আছ কেন? জবাব দাও। কেন ভূতের বাচ্চা পিলে?'

'ভূত বলে যে কিছু নেই এটা ছাত্রদের বোকাবার জন্যে।'

'কিছু যদি না থাকে তাহলে তোমার পেটে যে জিনিসটা গজগজ করছে সেটা কী? বল কী সেটা?'

'না মানে অসুখ-বিসুখ কিছু হয়েছে বোধ হয়।'

'অসুখ বিসুখ কিছু না। ভূতের বাচ্চা হজম হচ্ছে না। নীড়াও, নেবি কী করা যায়। নাকের ফুটো দিয়ে বের করে দিচ্ছি। সময় লাগবে। চট করে হবে না। পঞ্চাশটা বৈঠক নিতে হবে। তিন সের পরম পানি খেতে হবে। ফুরগির পালক দিয়ে নাকে সুড়সুড়ি নিতে হবে। তখন খুব হাঁচতে থাকবে। সেই হাঁচির সঙ্গে ভূত বেরিয়ে আসবে। অনেক যত্নশা।'

আমরা দু' জন বাসার ফিরে চলেছি। বুড়ো ভদ্রলোক ভূতের বাচ্চাটা বের করে আবার বোতলে ভরে আমাকে নিয়ে নিয়েছেন। অল স্যারের ঢেকুর তোলা বন্ধ হয়েছে। তবে তিনি খুব গভীর। একবার শুধু বললেন, 'ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'তাহলে কি স্যার ভূত আছে?'

'আত্রে না, ভূত আবার কি? ঐ বুড়ো আমাদের বোকা বানিয়েছে।

ব্যাটি মনে হচ্ছে বিরাট ফাজিল।’

‘কিছু স্যার আপনার টেনুর তো বহু হয়েছে।’

স্যার কিছু বললেন না। তাকে খুব চিন্তিত মনে হল। যেন কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছেন না।



জ্যেষ্ঠ মাসের শুরুতে এক দারুণ ব্যাপার হল।

নাইন-টেনের ছেলেরা মিলে ঠিক করল, আম-কাঁঠালের ছুটি খানিকটা এগিয়ে দেবার জন্যে হেড স্যারের কাছে দরবার করবে। দরবারটা হাতে জোরাল হয় সে জন্যেই সব ক্লাস থেকে দু’ জন করে যাবে। যে দু’ জন যাবে তারা যেন অবশ্যই খুব ভালো ছাত্র হয়। ফাস্ট-সেকেন্ড ইওয়া ছেলে হলে ভালো। স্যাররা ভালো ছাত্রদের ওপর চট করে রাগেন না।

দীপু হচ্ছে আমাদের ক্লাসের ফাস্ট বয়। সে সব শুনে বলল, ‘আগে-ভাগে ছুটি নিয়ে হবেটা কী? আম-কাঁঠালের ছুটি না হলেই সবচে ভালো হয়। মন দিয়ে পড়াশোনা করতে পারি।’

কথা শুনে রাগে গা ঘূলে যায়। ইচ্ছা করে ঠাস করে মাথায় একটা ছুটি বসিয়ে দিই। তার উপর নেই, এরা ভালো ছাত্র। স্যারের কাছে নালিশ করলে সর্বনাশ।

আমাদের ক্লাস থেকে কেউ দেখি যেতে রাজি নয়। আমি একাই সেলাম। বিরাট একটা দরখাস্তও লেখা হল। ক্লাস টেনের বগা ভাই (আসল নাম বদরুল ইসলাম। খুব লম্বা বলে আমরা তাকে ডাকি বগা ভাই) হেড স্যারের হাতে দরখাস্ত তুলে দিল। হেড স্যার বললেন, ‘ব্যাপার কি?’

বগা ভাই ভোতলাতে ভোতলাতে বলল, 'দরখাস্তে সব লে-লে-লে-লেখা আছে স্যার।' বগা ভাইয়ের এই একটা অসুবিধা, তার পেনে ভোতলাতে শুরু করে। এবং প্রতিটি বাক্য দু'বার করে বলে। সে আবার বলল, 'দরখাস্তে সব লে-লে-লেখা আছে স্যার।'

'লেখা যে আছে তা তো দেখতেই পারছি। ব্যাপারটা কী তোমাদের মুখ থেকে শুনে চাই।'

'আম-কাঁঠালের ছুটি দুই সত্তাহ এগিয়ে নিলে ভালো হয় স্যার।'

'কেন?'

আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওরি করছি। ছুটি এগিয়ে নিলে কেন ভালো হয়, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করি নি। হেড স্যার হংকার দিয়ে বললেন, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কথা বল।'

কেউ নড়াচড়া করছে না দেখে সাহসে ভর করে আমিই মুখ খুললাম। মিনমিন করে বললাম, 'এই বার তো স্যার পরম খুব বেশি পড়েছে, আম-কাঁঠাল সব আগে আগে পেকে গেছে। এই জন্যে স্যার ছুটিটা যদি এগিয়ে দেন।'

'আম-কাঁঠাল আগে আগে পেকে গেছে?'

'ছি স্যার।'

'কিনিয়ে কাঁঠাল পাকান কাকে বলে জানিস?'

'ছি না স্যার।'

'একুনি দেখবি কাকে বলে। কত বড় সাহস। বলে ছুটি এগিয়ে দিতে। যা ক্লাসে যা। ক্লাসে গিয়ে মীলডাউন হয়ে থাক।'

ক্লাসে ফিরে এসে মীলডাউন হয়ে আছি। বশির দাঁত বের করে হাসছে। কাউকে শান্তি দিতে দেখলে তার তারি আনন্দ হয়। সে আজ আর আনন্দ চেপে রাখতে পারছে না। কিছুকণ পরপর সব ক'টা দাঁত বের করে দিচ্ছে।

জিকিন টাইমে সত্ৱী কালিগন নোটিশ নিয়ে এল। হেড স্যার নোটিশ পাঠিয়েছেন-- "ছাত্রদের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে এই বৎসরের গ্রীষ্মকালীন বকের সময়সীমা দুই সত্তাহ কমিয়ে দেয়া হল।

নির্ধারিত সময়ের দুই সত্কাই পর থেকে বন্ধ শুরু হবে। এই নিয়ে কোনো রকম সেন-দরবার না করবার জন্য ছাত্রদের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।”

ছুটির পর খুবই মন খারাপ করে বাসায় ফিরলাম। কী করা যায় কিছুই বুঝতে পারছি না। এখন ছুটি এগিয়ে আনবার দরকার নেই; যথাসময় ছুটি আরম্ভ হলেই আমরা খুশি। তেমন কোনো সঙ্কটনা দেখা যাচ্ছে না। আমাদের হেড স্যার খুব কঠিন টীজ।

সন্ধ্যার আগে আগে মুনির এসে উপস্থিত। সেও ছুটি কমে যাওয়ায় মন খারাপ করেছে। এই ছুটিতে তার মামাবাড়ি যাবার কথা। ছুটি কমে গেলে আর যাওয়া হবে না।

মুনির বলল, ‘চল তাঁর কাছে যাই। তিনি যদি কোনো বুদ্ধি দেন।’

‘কাল কথা বলছিলাম।’

‘আমাদের যিনি ভূতের ব্যাটা দিলেন। ঐ যে রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে।’

‘তিনি বুদ্ধি দেবেন কেন?’

‘সিঁতেও তো পারেন। আমাদের কথা তো তিনি শোনেন। শোনেন না?’

‘চল যাই। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তিনি হেড স্যারের মতো রোগে যাবেন। সব বড়রা এক রকম হয়।’

‘তবু বলে দেখি।’

বুড়ো ভদ্রলোক দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে আমাদের সমস্যা তুললেন। তারপর বললেন, ‘অন্যায়, খুবই অন্যায়। ছুটি কমাবার কোনো রাইট নেই। ব্যাটা ছেলেগুলোকে সারাদিন জুলে আটকে রেখেও পথ খিটছে না, এখন আবার ছুটি কমিয়ে দিচ্ছে। রবি ঠাকুর বেঁচে থাকলে খুব রাগ করতেন।’

আমি বললাম, ‘এখন আমরা কী করব বলুন।’

‘ভূতের ব্যাকাকে বলা ছাড়া তো কোনো পথ দেখছি না।’

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ভূতের বাতাকে কী বলব?'

'তোমাদের সমস্যার কথা বলবে। কবে থেকে স্কুল বন্ধ করতে চাও এটা বলে দেবে, তাহলেই হবে।'

'কী যে আপনি বলেন!'

'কী যে আমি বলি মানে? এক চড় লাগাব, বুঝলে। যা করতে বলছি কর। বোতলটা মুখের কাছে এনে ফিসফিস করে বলবে। বলবে যেন আগামীকাল থেকেই আম-কাঁঠালের ছুটি সেবার ব্যবস্থা করে। খুব ভদ্রভাবে বলবে। আরেকটা কথা, মাসে একবারের বেশি কিছু চাইবে না, ভূত এখনো খুবই বাস্তব। কমতা কম। আরেকটু বড় হোক, তখন ঘনঘন চাইতে পারবে।'

আমি বললাম, 'থ্যাংক ইউ।'

বুড়ো আশুন ডোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে ইংরেজি? এর মানে কী?'

'জমা করে দিন স্যার। আর বলব না। আমরা এখন যাই স্যার?'

'না। আমি গতকাল একটা কবিতা লিখেছি, এটা শুনে তারপর যাও। তোমাদের নিয়েই লেখা।

কবিতার নাম "বীর শিশু"।

মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চ'ড়ে
দরজা দু'টো একটুকু ফাঁক করে
আমি যাচ্ছি রাত্তা ঘোড়ার "পরে
উপবিলিয়ে তোমার পাশে পাশে।"

আমার কেন জানি মনে হল এই কবিতাটা আগেও শুনেছি। তবে সেই কবিতাটার নাম ছিল বীরপুরুষ, বীরশিশু নয়। তবে এটা নিয়ে ঘটিখাটি এখন না করাই আমার কাছে ভালো মনে হল। বুড়োকে রাগান ঠিক হবে না।

আমরা বাড়ি চলে এলাম। বুড়োর কথা ঠিক বিশ্বাস হল না।
বোতলের ভেতর ভূত যদি থেকেও থাকে সে জুল বন্ধ করবে কী
ভাবে?

তবু রাতে শোবার আগে টাংকে থেকে বোতল বের করে ফিসফিস
করে বললাম, 'ভাই বোতল ভূত, তুমি কেমন আছ? ভাই তুমি কি
আমাদের জুলটা আগামী কাল থেকে বন্ধ করে দিতে পারবে? লক্ষী
ভূত, ময়না ভূত। নাও না বন্ধ করে।'

অরু আপা কী কাজে যেন ঘরে ঢুকেছিল। সে অবাক হয়ে বলল,
'এসব কী হচ্ছে রে?'

আমি বললাম, 'কিছু হচ্ছে না।'

'কাল সঙ্গে কথা বলছিস?'

'বোতলের ভূতের সঙ্গে।'

অরু আপা গভীর হয়ে বলল, 'বোতলের ভূতের সঙ্গে কী কথা
হচ্ছিল শুনি।'

'তোমার শোনার সরকার নেই।'

'আহা শুনি না।'

'বোতলের ভূতকে বলেছি আগামীকাল থেকে জুল বন্ধ করে দিতে।
সে বন্ধ করে দেবে।'

'তোমার মাথাটা খারাপ হয়েছে।'

'হলে হয়েছে।'

বাড়িতে দারুণ হৈচৈ পড়ে গেল। বাবা ভেঁকে নিয়ে বললেন, 'এসব
কী হচ্ছে রে! তুই নাকি বোতলের ভূতকে বলছিস জুল বন্ধ করতে?'

বড়চাচা বললেন, 'পাঞ্জিটার কানে ধরে চড় দেয়া সরকার। ভূত-
প্রেতের কাছে দরবার করছে। ভূত আবার কি রে? দশবার কানে ধরে
গুঠ-বোস কর। আর যা, তোর সেই বিখ্যাত বোতল কুয়োয় ফেলে
দিয়ে আর। এফুনি যা।'

বড়চাচার কথার উপর দ্বিতীয় কথা চলে না।

বোতল ভূত কুরোর ফেলে দিতে হল। পরদিন খুবই মন খারাপ করে ফুলে গেলাম। এ্যাসেম্বলিতে সবাই দীড়িয়ে আছি। সোনার বাংলা গান হয়ে যাবার পর হেভ স্যার বললেন, 'তোমাদের জন্যে একটা সুসংবাদ আছে। ফুলের জন্যে সরকার থেকে দুই লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। এখন তোমরা পাবে পাকা দালান। দালানের কাজ শুরু করতে হবে বসার আগেই। কাজেই আজ থেকেই তোমাদের গরমের ছুটি। অন্যবারের চেয়ে এবার তোমরা দু' সপ্তাহ বেশি ছুটি পাবে। তবে ছুটিটা কাজে লাগাবে। শুধু খেলাধুলা করে নষ্ট করবে না।'

আমি হতভম্ব হয়ে দীড়িয়ে রইলাম। ব্যাপারটা কি বোতল ভূতের কারণেই ঘটল?

'ভাই বোতলভূত, তুমি কেমন আছ?'



গরমের ছুটি ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত।

ছুটির আগে কত রকম পরিকল্পনা থাকে--এই করব ঐ করব।
কখন সত্যি সত্যি ছুটি শুরু হয়, তখন কিছু করার থাকে না। সব
কেমন পানসে মনে হয়।

এখন আমাদের তা-ই লাগছে। কুল ছুটি। কত আনন্দ হবার কথা,
কিন্তু কোনো আনন্দ হচ্ছে না। এনিকে বড়চাচা কঠিন কঠিন সব নিয়ম-
কানুন জারি করছেন। যেমন আজ সকালেই বললেন, 'ছুটিটা কাজে
লাগাবার ব্যবস্থা কর। পাটীগণিতের সব অঙ্ক শেষ করে ফেল।'

আমি বললাম, 'একুনি সব অঙ্ক শেষ করে ফেললে সারা বছর কী
করব?'

বড়চাচা বললেন, 'চড় দিয়ে দীত ফেলে দেব। মুখে মুখে কথা
বলে। যা পাটীগণিতের বই নিয়ে আর। দেখব কত ধানে কত চাল।'

কী অল্প করব, বই নিয়ে এলাম। বড়চাচা চড় দিয়ে সত্যি সত্যি
দীত ফেলে দিতে পারেন। আমার ছোট ভাই অতুর একটা দীত তিনি
এইভাবেই ফেলেছেন। অবশি সেটা ছিল নড়া দীত। এমনিতেই পড়ত,
চড় খেয়ে দু'-এক দিন আগে পড়ে গেল। বড়চাচার নাম ফটল। তিনি
সেই দীত ডেটল দিয়ে ধুয়ে হরলিঅের একটা খালি বোতলে ভরে
নিজের ঘরে রেখে দিলেন। বোতলের গায়ে লিখে দিলেন--'চড় দিয়ে
ফেলা দীত। দুই পিণ্ড সাবধান।'

বড়চাচা হাঁকো টানতে টানতে সারা দুপুর আমাকে গসাও এবং
গসাও করালেন। কুৎসিত সব অঙ্ক--গুণ দাও, ভাগ দাও, আবার গুণ,
আবার ভাগ। কী হয় এসব গুণ-ভাগ করে? পৃথিবী থেকে অঙ্কটা উঠে

গেলে কত ভালো হত।

লসানু লসানু করতে করতে একবার ভাবলাম বোতল ভূতকে বলব--ও ভাই বোতল-ভূত, লক্ষ্মী ভাই, ময়না ভাই, তুমি পৃথিবী থেকে অঙ্ক নামের এই খারাপ জিনিসটা দূর করে দাও। একদিন তোমো ঘুম থেকে উঠে সবাই যেন দেখে অঙ্ক বইয়ের সব লেখা মুছে গেছে। সব পাতা সাদা। নামতা-টামতাও কারোর মনে নেই। তিন দু' গুণে কত কেউ বলতে পারে না। এমন কি অঙ্ক সাররাও না। এক দুই কী করে লিখতে হয় তাও কেউ বলতে পারে না।

অবশ্য আমি জানি বোতল ভূতকে এসব বলে লাভ নেই। সে কিছু করতে পারবে না। তার উপর বোতলটা ফেলে দেয়া হয়েছে কুয়োয়। বোতল ভেঙে ভূত কোথায় চলে গিয়েছে কে জানে।

বেলা তিনটা বেজে গেল, তবু বড়চাচা আমাকে ছাড়লেন না। যখনই বলি, 'আজ উঠি চাচা?' তখনই তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, 'কোনো কথা না। একটা কথা বললে চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব। সেই দাঁত চলে যাবে হরলিঙ্কের কৌটার।'

বিকেল হয়ে গেল। আমাদের ফুটবল টিমের হেলেরা আমার জন্যে ঠকিঝুঁকি নিতে শুরু করল। তবু বড়চাচা আমাকে ছাড়বেন না। বড়রা ছোটদের এত কষ্ট কী করে দেয় কে জানে। তারা কি কখনো ছোট ছিল না?

আমি বললাম, 'বিকেল হয়ে গেছে চাচা, এখন উঠি?' বড়চাচা হংকার নিয়ে বললেন, 'শুধু খেলার দিকে মন। কোনো ওঠাউঠি নেই। তোকে দিয়ে আমি বৃষ্টি পরীক্ষা দেওয়াব। খেলাধুলো করে হয় কী? ফুটবল খেলতে গিয়ে হাত-পা ভেঙে যাবে ফিরবি। তার কোনো প্রয়োজন দেখছি না।'

'আমি সারাদিন পড়ব?'

'নিশ্চয়ই সারাদিন পড়বে। জীবনে উন্নতি করতে চাইলে সারাদিন পড়তে হবে। ছাত্রনং অধ্যয়নম তপঃ।'

'আমি জীবনে উন্নতি করতে চাই না বড়চাচা।'

'জীবনে উন্নতি করতে চাস না?'

'না।'

বড়চাচা ঠাস করে একটা চড়ু বসিয়ে দিলেন। প্রথমতঃ গলায় বললেন, 'তোমার বেআদবীর বিচার সন্ধ্যাবেলা হবে।'

সন্ধ্যাবেলা সত্যি সত্যি বিচার-সভা বসল। বড়চাচা, বাবা এবং আমাদের প্রাইভেট স্যার--তিন জন বসলেন তিন দিকে। আমি মাঝখানে। বড়চাচা স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হুমায়ূন সম্পর্কে তোমার ধারণা কি মাস্টার বল তো।'

স্যার শুকনো গলায় বললেন, 'ওর মাথায় কিছু নাই।'

বড়চাচা ঠান্ডা গলায় বললেন, 'মাথায় কিছু নেই এই কথাটা তো মাস্টার তুমি ঠিক বললে না। মাথায় ওর আছে গোবর। পচা গোবর।'

আমাদের স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'খুবই খাঁটি কথা বলেছেন। গোবর দিয়ে মাথা ভর্তি।'

'যে ভাবেই এসে থাক আমাদের বীচাও।'



বড়চাচা বললেন, 'তবে সাধনার অনেক কিছু হয়। কবি কালিদাসেরও মাথাভাঙা ছিল গোবরা। মহামুর্খ ছিলেন। সাধনার অন্য পরবর্তীকালে হলেন--মহাকবি কালিদাস। কি বল মাষ্টার, ঠিক না?'

'একেবারে খাটি কথা।'

'কাজেই আমরা এখন দেখব সে যেন সাধনা ঠিকমতো করতে পারে। গরমের এই ছুটির মধ্যে হুমায়ুনকে আমরা ঠিকঠাক করে ফেলব। কি বল মাষ্টার?'

'খুবই ভালো কথা।'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। বড়চাচা আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবেন।

এখন আমি উঠি সূর্য ওঠার আগে। কিছুক্ষণ বড়চাচার সঙ্গে মর্নিং-ওয়াক করে পড়তে বসি। সেই পড়া চলে এগারটা পর্যন্ত। দুপুরের খাওয়ার পর শুষ্ক হয় পাটীগলিত। বিকেল পাঁচটায় ছুটি। কীটার কীটার এক ঘন্টার ছুটি। ছ'টার মধ্যে বাসায় ফিরে বই নিয়ে বসতে হয়। রাত দশটায় ছুটি। কী যে কষ্ট! রোজ একবার কুয়োর সামনে গিয়ে বলি, 'বোতল ভূত, ও ভাই বোতল ভূত! বড়চাচার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও ভাই।'

কোনোই লাভ হয় না। ভূত হয়তো আমার কথাই শুনতে পায় না। কত নিচে পড়ে আছে, শোনার কথাও নয়। কিংবা কে জানে হয়তো বোতল ভেঙে গেছে। ভূতের বাচ্চা আর বোতলের ভেতর নেই। থাকলে সে নিশ্চয়ই আমার কষ্ট দেখে কিছু একটা করত।

এই রকম যখন অবস্থা, তখন এক কান্ড হল। রাতে ঘুমুতে গেছি। শুতে গিয়ে দেখি পিঠের নিচে শক্ত কী যেন লাগছে। হাত দিয়ে দেখি--কী আশ্চর্য, ঐ বোতল। এখানে এল কী করে। কুয়োর বে বোতল ফেলে দেয়া হয়েছে সেই বোতল এখানে এল কী করে।

ব্যাপারটা কী? ব্যাপার যা-ই হোক, তা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। আপাতত বড়চাচার হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। আমি খুব করুণ

গলায় কীদো কীদো করে বললাম, 'ভাই তুমি কীভাবে এখানে এসেছ জানি না। যে-ভাবেই এসে থাক, তুমি আমাকে বীচাও। বড়চাচার হাত থেকে রক্ষা কর।' এই বলে আমি বানিকঞ্চণ কীদলাম। এতে কোনো লাভ হবে ভেবে আমি বলি নি। তবু বলা তো যায় না। হতেও তো পারে।

পরদিন ভোরবেলা বই নিয়ে বসেছি। বড়চাচা ঢুকলেন। গভীর গলায় বললেন, 'চিন্তা করে দেখলাম ছুটির সময়টাতে ছুটি থাকা দরকার। রাতদিন বই নিয়ে পড়ে থাকলে ছেলেপুলে পাখা হয়। যখন স্কুল ছুটি থাকবে, তখন ভোরও ছুটি। যা বই তুলে রাখ।'।

আমি অবাক হয়ে বড়চাচার নিকে তাকিয়ে রইলাম।



আমাদের আনন্দের এখন আর সীমা নেই।

বড়চাচার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। আনন্দের প্রকাশ কী ধরনের হলে ভালো হবে, বুঝতে পারছি না। কী করা যায়? মূনির বলল, 'আমাদের ফুটবল ক্লাব ঠিকঠাক করে একটা ম্যাচ দিয়ে দিলে কেমন হয়?'

আমি বললাম, 'অতি উত্তম হয়।'।

আমাদের ফুটবল ক্লাবের নাম হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। দু' বছর আগে আমরা ফুটবল ক্লাব শুরু করি। প্রথম বৎসর আমাদের কোনো বল ছিল না। কী করব, চীদা উঠেছে মাত্র আঠার টাকা। সেই আঠার টাকায় আমরা একটা ফুটবল পাম্প কিনি। আমাদের কান্ড দেখে অরু আপা হেসে বীচে না। একটা ছড়া বানিয়ে ফেলল।

‘বল নেই আছে পাশ্চাত্য
সার্ট নেই আছে জাম্পার।।’

যাই হোক, শরের বখসর আমরা দুই নম্বরী একটা বল কিনলাম।
পাড়ান্তে আরো তিনটে ফুটবল ক্রাব আছে। ওদের সঙ্গে ম্যাচ দিলাম।
এই শুনে অরু আপা ঠেটি উঠে বলল, ‘একেক জন চামটিকার মতো,
তোরা ফুটবল খেলবি কী? বাতাস লাগলে উঠে পড়ে যাস। এক কাজ
কর, তোদের ক্রাবের নাম দিয়ে দে-- সি রয়েল চামটিকা ক্রাব।’

রাগে আমাদের গা জ্বলে গেল। ভাবলাম, এমন খেলা দেখাব যে
অরু আপা টারা হয়ে বাবে। হল উঠেটা--আমরা টারা হয়ে গেলাম।
একেকটা খেলা হয়, আমরা দশটা-বারোটা করে গোল খাই।

তবে এবার যাতে এ রকম না হয় সে চেষ্টা অবশ্যই করব।

আমাদের কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল। ম্যাচ দিয়ে দিলাম। বিরাট
উত্তেজনা আমাদের মধ্যে। অরু আপা সব শুনে হাসতে হাসতে বলল,
‘সি রয়েল চামটিকা ক্রাব নাকি ম্যাচ দিয়েছে। তোদের লজ্জা-শরমও
নেই নাকি?’

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, ‘বখন চ্যাম্পিয়ান হব, তখন বুঝবে
কাকে বলে চামটিকা ক্রাব।’

‘তোরা চ্যাম্পিয়ান হবি? খোঁড়া চালাবে বাইসাইকেল?’

‘হ্যাঁ চালাব।’

‘যদি চ্যাম্পিয়ান হতে পারিস, তাহলে আমি আমার মাথার চুল
কেটে ফেলব। সত্যি বলছি।’

এই বলে মাথাভর্তি চুল কীকাতে কীকাতে অরু আপা চলে গেল।
আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। আমাদের দলটা হচ্ছে সবচেয়ে
খারাপ। আমরা যে লাভটা-গুডটা হব, এটা চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া
যায়। নাকু হচ্ছে আমাদের গোলকিপার। এমনিতে সে চোখে খুব ভালো
দেখে, কিন্তু যখন বল গোলের দিকে আসে--তখন নাকি সব অন্ধকার
হয়ে যায়। চোখে কিছু দেখে না। আসলেই তাই। বল একদিকে আসে,
সে অন্যদিকে ডাইত দেয়।

আমাদের ব্যাকে খেলে পরিমল। বল তার পায়ে আসতেই সে হৌচট খেয়ে পড়ে যায়। কেন এ রকম হয় কে জানে। শুকনো খটখটে মাঠ। পা পিছলানোর কোনো কথা নয়, অর্ধ পরিমলের কাছে বল যেতেই হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে যাবে।

আমরাও একই রকম, শুধু টগর খুব ভালো খেলে। ও হচ্ছে আমাদের ষ্ট্রাইকার। কোনোমতে ওর কাছে বল পৌঁছে দিলে গোলে বল ঢোকাবেই। এক জনের ওপর ভরসা করে কি চ্যাম্পিয়ান হওয়া যায়? যায় না। ফুটবল হল এগার জনের খেলা। তবু আমরা মন্য করলাম না। গ্রীন ব্যাজ ক্লাবের সঙ্গে এক গোলে জিতলাম। টগর একবার মাত্র বল পেয়েছিল। সেটা দিয়েই গোল করেছে। অরুণিমা ক্লাবের সঙ্গে ডু হল চার-চার গোলে। আমাদের দিকের চারটা গোলই করেছে টগর। এবং আন্তর্ধের ব্যাপার, আমরা শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠে গেলাম। অরুণ আবার মুখ শুকিয়ে গেল। যদি সত্যি সত্যি জিতে যাই, তাহলে মাথা-ভর্তি চুল কাটতে হবে।

ফাইনাল খেলার দিন শহরে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আমাদের পাড়ায় এক জন নেতা আছেন। তিনি শুধু ইলেকশান করেন আর ফেল করেন। তাঁর নাম মতিন সাহেব। তিনি ফাইনাল খেলার দিন ভোরবেলা একটা শিশু ঘোষণা করে দিলেন--সেই সঙ্গে ফাইনাল খেলা যাতে ঠিকমতো হয় সে জন্য তিন শ' টাকা চাঁদা দিলেন। নিজেই মাইকের ব্যবস্থা করে দিলেন। সকাল থেকে রিক্সা করে মাইক বাজতে থাকল।

'তাইসব, অন্য বৈকাল চার ঘটিকার আব্দুল মতিন ফুটবল শিল্পের ফাইনাল খেলা। রয়েল বেঙ্গল ব্যাজ ক্লাব একাদশ বনাম বুলেট একাদশ। উদ্বোধন করবেন অরুণ অঞ্চলের বিশিষ্ট সমাজসেবী, জনগণের নয়নের মণি, দেশদরদী সত্ৰাঘ্রী জননেতা জনাব আব্দুল মতিন ময়না মিয়া। তাইসব--'

আমাদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা। শুধু আমাদের না, উত্তেজনা বড়দের মধ্যেও। বড়চাচা আমাকে ভেঁকে বললেন, 'কী, তোরা পারবি তো?'

আমি হচ্ছি সনের ক্যাপ্টেন। কাজেই আমাকে বলতে হল,
'ইনশাআল্লাহ পারব।'

'তোরা তো খেলতে জানিস না, তোরা পারবি কী করে? একমাত্র
খেলোয়াড় হচ্ছে উপর। সেই বেচারী একা কী করবে?'

'সে একাই একশ।'

মুখে বললাম ঠিকই, কিন্তু ভরসা পেলাম না। কারণ বুলেট ক্লাব
বাইরে থেকে হায়ার করে তিন জন প্রেরার এনেছে। এক-এক জন ইয়া
জোয়ান। এদের এক জনের নাম ল্যাংছু, কারণ তার কাজই হচ্ছে ল্যাং
ঘেরে ফেলে দেয়া। সেই ল্যাংও এমন ল্যাং যে প্রেরারের পা ভেঙে যায়।
ল্যাংছু নাকি এইভাবে এর আগে তিন জনের পা ভেঙেছে। উপরের পা
ভেঙে সে এক হালি পুরো করবে। কী সর্বনাশের কথা।

চারটার সময় খেলা শুরু হবে। দুটো বাজতেই উপর শুকনো মুখে
এসে উপস্থিত। সে নাকি খেলবে না। আমি বললাম, 'কেন খেলবি না?
ল্যাংচুর তয়ে?'

'বুলেট ক্লাবের বগা ভাই বলেছে আমি যদি খেলি, তাহলে আমাকে
ফর্দাফাই করে দেবে।'

'বগা ভাই নিজে বলেছে?'

'হঁ।'

বগা ভাই বলে থাকলে সত্যি তয়ের কথা। কারণ বগা ভাই বিরাট
শুভা। তার এতদিনে ম্যাটিক পাশ করে কলোজে গড়া উচিত। কিন্তু সে
ফেল করে করে ক্লাস এইটে আটকে আছে। কাজের মধ্যে কাজ সে যা
করে তা হচ্ছে বিড়ি টানে। খারাপ খারাপ কথা বলে আর আমাদের
মতো অসব্বসী ছেলেপুলে দেখলে বিনা কারণে যারখোর করে।
আমাদের ক্লাসের পুতুল একদিন কুল ছুটির পর বাড়ি আসছে, হঠাৎ
বগা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বগা ভাই বললেন, 'তুনে যা।' পুতুল দেখল
পালান অসম্ভব। সে এগিয়ে এল। বগা ভাই বলল, 'শিগড়ার কাজক
কেনন জানিস?'

'জানি।'

‘উই, ভালোমতো জানিস না। তবে এখন জানবি।’

এই বলেই লাল পিঁপড়ার একটি বাসা ভেঙে পুতুলের মাথায় টুপি মতো পরিয়ে দিল। ভয়াবহ অবস্থা। এই বগা ভাইয়ের কারণে টগর যে খেলবে না, তা তো জানা কথাই।

তবু টগর না, কিছুক্ষণ পর করিম এসে বলল, সেও খেলবে না। করিম সেক্টর ফরোয়ার্ডে খেলে। খুব খারাপ না। টগরের মতো অবশি না, তবুও ভালো।

আমি বললাম, ‘তুই খেলবি না কেন? বগা ভাই কিছু বলেছে?’

‘না।’

‘তাহলে খেলবি না কেন?’

‘ইচ্ছা হচ্ছে না, ভাই খেলব না।’

এই বলেই করিম লম্বা একটা ঘাসের ডাঁটা নিয়ে চিবুতে লাগল। তার ভাবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে বগা ভাই তাকেও ভয় দেখিয়েছে।

আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ন’ জন প্রেয়ার নিয়ে কী খেলব? অরু আপা বলল, ‘তোরা খেলা বন্ধ করে পানিয়ে যা। আজ মাঠে তোদের তুলোধুনো করবে। কমসে কম দু’ জনের পা ভাঙবে। এক জনের হবে কম্পাউন্ড ফ্রাকচার।’

মাঠে নাম দিয়ে পিছিয়ে পড়া যায় না। সাড়ে তিনটায় মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলাম। লোকে লোকারণ্য। দু’লেট ক্লাবের প্রেয়াররা বল নিয়ে মাঠে ছোটাছুটি করছে। তাদের সবার মুখভর্তি হাসি।

মাঠের দক্ষিণ দিকে টেবিলের উপর শিশু। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে চেয়ার সাজান। দেশদরদী জননেতা আব্দুল মতিন সাহেব এসে পড়েছেন। তাঁর গলায় ফুলের মালা। বগা ভাইকেও দেখলাম। খুব ক্ষুঁর্তি। একটু পরপর হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে।

আমরা মুখ শুকনো করে মাঠে নামলাম। পকেটে বোতল ভূতের শিশি। আমি মনে মনে বললাম, ‘ভাই বোতল ভূত। আমাদের রক্ষা কর ভাই।’

‘উই, ভালোমতো জানিস না। তবে এখন জানবি।’

এই বলেই লাল পিঁপড়ার একটা বাসা ভেঙে পুতুলের মাথায় টুপি মতো পরিয়ে দিল। ভয়াবহ অবস্থা। এই বগা ভাইয়ের কারণে টগর যে খেলবে না, তা তো জানা কথাই।

তবু টগর না, কিছুক্ষণ পর করিম এসে বলল, সেও খেলবে না। করিম সেক্টর ফরোয়ার্ডে খেলে। খুব খারাপ না। টগরের মতো অবশ্যি না, তবুও ভালো।

আমি বললাম, ‘তুই খেলবি না কেন? বগা ভাই কিছু বলেছে?’
‘না।’

‘তাইলে খেলবি না কেন?’

‘ইচ্ছা হচ্ছে না, ভাই খেলব না।’

এই বলেই করিম লম্বা একটা ঘাসের ডাঁটা নিয়ে চিবুতে লাগল। তার ভাবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে বগা ভাই তাকেও ভয় দেখিয়েছে।

আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। ন’ জন প্রেয়ার নিয়ে কী খেলব? অরু আপা বলল, ‘তোরা খেলা বন্ধ করে পানিয়ে যা। আজ মাঠে তোদের তুলোখুনো করবে। কমসে কম দু’ জনের পা ভাঁঙবে। এক জনের হবে কম্পাউন্ড ফ্লাকচার।’

মাঠে নাম দিয়ে পিছিয়ে পড়া যায় না। সাড়ে তিনটায় মাঠে গিয়ে উপস্থিত হলাম। লোকে লোকারণ্য। বুলেট ক্লাবের প্রেয়াররা বল নিয়ে মাঠে ছোটাছুটি করছে। তাদের সবার মুখভর্তি হাসি।

মাঠের দক্ষিণ দিকে টেবিলের উপর শিঙা। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে চেয়ার সাজান। দেশদরদী জননেতা আব্দুল মতিন সাহেব এসে পড়েছেন। তাঁর গলার ফুলের মালা। বগা ভাইকেও দেখলাম। খুব ক্ষুর্তি। একটু পরপর হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে।

আমরা মুখ শুকনো করে মাঠে নামলাম। পকেটে বোতল ভূতের শিশি। আমি মনে মনে বললাম, ‘ভাই বোতল ভূত। আমাদের রক্ষা কর ভাই।’

রয়েল বেঙ্গল ফুটবল ক্লাব বনাম বুলেট ক্লাবের ফাইনাল খেলায় এমন হলখুল হবে কে ভেবেছিল? মাঠ লোকে লোকারণ্য। একটা ব্যান্ড পাঁচি পর্যন্ত আছে। কিছুক্ষণ পরপর ব্যান্ড পাঁচি বাজাচ্ছে--হলুদ বাট, মেনি বাট, বাট ফুলের মট। এই একটি মাত্র গানই এরা জানে। সব অনুষ্ঠানে এই গান।

ব্যান্ড পাঁচি এনেছেন আব্দুল মতিন সাহেব। তাঁর কাজকরাখানা এ রকমই। সব সময় চান লোকজনকে চমকে দিতে। যারা ইলেকশন করে তাদের নাকি এরকম করতে হয়। কোথাও লোকজন জড়ো হলে একটা ভাষণ দিতে হয়। আজও নিশ্চয়ই দেবেন।

মাইক এসেছে। রোগা একটা ছেলে কিছুক্ষণ পরপর বলছে--
'হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রী ফোর। মাইক্রোফোন টেস্টিং।
রোগা ছেলেটি চলে যাবার পর তার চেয়েও রোগা আরেকটি ছেলে এসে
মাইকের সামনে দাঁড়াল। খুব কায়দা করে বলল, 'জরুরী ঘোষণা,
জরুরী ঘোষণা। তাইসব, একটি বিশেষ ঘোষণা। অত্র অঞ্চলের বিশিষ্ট
সমাজসেবী, জনগণের নয়নের মণি, এ যুগের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, জনাব
আব্দুল মতিন মরনা মিয়া এই মাত্র একটি স্বর্ণপদক ঘোষণা করেছেন।
আজকের এই ফাইনাল ম্যাচের সেরা ফুটবল খেলোয়াড়ের জন্যে এই
স্বর্ণপদক। খেলার শেষে এই স্বর্ণপদক দেয়া হবে। তাইসব, জরুরী
ঘোষণা--'

এই ঘোষণায় বুলেট ক্লাবের সবার মুখে হাসি দেখা গেল। কেনই
বা হাসি দেখা যাবে না? শিশু, স্বর্ণপদক সব তো ওরাই পাবে। আমরা
হাত-পা ভেঙে বাড়ি ফিরব।

আমরা মুখ শুকনো করে মাঠে নামলাম। ব্যান্ড পাঁচি বিপুল
উৎসাহে বাজাতে লাগল--হলুদ বাট, মেনি বাট, বাট ফুলের মট।

রেফারী হচ্ছেন আমাদের স্কুলের ড্রিল স্যার--অজিত বাবু। খুব
রোগা বলে আমরা তাঁর নাম দিয়েছি 'জীবাণু স্যার'।

জীবাণু স্যার আমাদের দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'তোরা মাত্র ন'
জন কেন? বাকি দু'জন কই?'

আমি বললাম, 'ওরা খেলবে না স্যার।'

'কেন?'

'বুলেট ক্লাবের বগা ভাই ভয় দেখিয়েছে, খেলতে নামলে পা তেঙে দেবে।'

'বলিস কী!'

'সত্যি কথা স্যার। ওদের সঙ্গে এক জন আছে—নাম ল্যাংচু। ওর কাজই হচ্ছে ল্যাং মারা। ল্যাং মেরে পা তেঙে ফেলা।'

'খিঁচিঁ না, ভাঙতেও পারে। সাবধানে খেলবি। খবরদার, চার্জ-ফার্জ করতে যাবি না।'

জীবাণু স্যার বীণিতে ফুঁ দিলেন। খেলা শুরু হল। আমি পকেটে হাত দিয়ে কীপা-কীপা গলায় বললাম, 'ও ভাই বোতল ভূত, আমাদের বীচাও ভাই।'

কথা শেষ হবার আগেই দেখা গেল বগা ভাই বিনুৎপতিতে বল নিয়ে আমাদের গোলপোস্টের দিকে যাচ্ছে। বদরুল তাকে আটকাতে গিয়ে উল্টে পড়ে গেল। কারণ ল্যাংচু তাকে পেছন থেকে ল্যাং মেরেছে। গোলপোস্টে আমাদের গোলকিপার নান্টু চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। এটাই হচ্ছে তার নিয়ম। বল নিয়ে কেউ গোলপোস্টের দিকে আসতে থাকলেই আপনাতাই তার চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

বগা ভাই গোলপোস্টের প্রায় ছ'গজের ভেতর চলে এসেছে। নান্টু চোখ বন্ধ করে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তখন একটা অঘটন ঘটল। মনে হল কেউ এক জন যেন প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে বগা ভাইয়ের গালে। বগা ভাই থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। তার পায়ে বল, অথচ সে শট দিচ্ছে না। মাঠে তুমুল হৈচৈ—'কিক দাও। কিক দাও। হাবার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন, কিক দাও।'

বগা ভাই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রচণ্ড কিক দিল। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য। প্রচণ্ড কিকের পরও বলের অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হল না। বলটা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় গড়িয়ে যাচ্ছে। এক সময় নান্টুর

পায়ের কাছে বলটা ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই দাঁড়িয়ে থাকা বলের উপর নাশ্টু বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন ভঙ্গি করতে থাকল, যেন সে বুলেটের মতো গতির বলকে অপূর্ব কায়দায় আটকেছে।

মজা আরো জমল। বুলেট ক্রাবের যে কোনো প্রেয়ার বল নিয়ে এগিয়ে এলেই অদৃশ্য কে যেন চড় বসিয়ে দেয়।

ল্যাংচু হতভম্ব। কারণ কিছুক্ষণ পরপর সে চড় খাচ্ছে। একবার দেখা গেল সে কোমরে হাত দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। হাসি আর থামেই না। মাঠের সবাই হতভম্ব।

ড্রিল স্যার অবাক হয়ে বললেন, 'এই ছেলে, তুমি এরকম করছ কেন? হাসছ কেন?'

মাঠে তুমুল হৈ চৈ--কিক দাও। কিক দাও।



ল্যাংচু করণ মুখে বলল, 'কী করব স্যার বলুন--কে যেন কাঁড়ুকুতু দিচ্ছে।'

'কাঁড়ুকুতু দিচ্ছে মানে! কী বলছ তুমি?'

'সত্যি দিচ্ছে স্যার। হি হি হি। হো হো হো। হি হি হি। হিক হিক হিক।'

হাসতে হাসতে ল্যাংচু গড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুত কাণ্ড! ওরা বলে কিক করলে বল নড়ে না। যেন পাথরের বল। বুলেট দলের ক্যাপ্টেন হচ্ছে মুশতাক। সে একবার বলে কিক করে 'উফ' করে চেঁচিয়ে উঠল। ড্রিল স্যার বললেন, 'কী হয়েছে?'

'স্যার, বল আঙনের মতো গরম। পা পুড়ে গেছে স্যার। পায়ে ফোঁকা পড়ে গেছে।'

'পাগুলের মতো কথা বলিস না তো। বল গরম মানে!'

'আপনি হাতে নিয়ে দেখুন স্যার।'

ড্রিল স্যার বল হাতে নিয়ে বললেন, 'বল যে রকম, সে রকমই তো আছে। কী বলছিস ভোয়া!'

হাফ টাইমের দশ মিনিট আগে আমরা একটা গোল করে ফেললাম। আমরা গোল করলাম বলটা ঠিক হল না। বলটা আপনা-আপনি গোলে পড়ল।

ড্রিল স্যার পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে পড়লেন। বীশি বাজাবেন কিনা বুঝতে পারলেন না।

হাফ টাইমের পর বুলেট ক্লাব আর খেলতে রাজি হল না। আবদুল মতিন সাহেব মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। সেরা খেলোয়াড়ের স্বর্ণপদক কাকে দেবেন বুঝতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত সেই স্বর্ণপদক নান্টুর কপালে জুটল। সে থোমে থাকা বল অটকানর জন্যে পেয়ে গেল স্বর্ণপদক।

আবদুল মতিন সাহেব কীপা গলার একটা তাবণ দিলেন--'রয়েল বেঙ্গল ফুটবল ক্লাবের উজ্জ্বল প্রতিভা, অত্র অঞ্চলের বিখ্যিত খেলকিপার, নান্টুর অপূর্ব ক্রীড়াশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে দেয়া হচ্ছে

আবদুল মতিন স্বর্ণপদক। তাইসব, হাততালি দিন। হাততালি।’

প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। সেই সঙ্গে ব্যাড বেজে উঠল—হলুন বাট, মেনি বাট, বাট ফুলের মউ—।



অরু আপা বলেছিল--আমাদের রয়েল বেঙ্গল ফুটবল চিম চ্যাম্পিয়ান হলে সে তার মাথার চুল কেটে ফেলবে। এসব হচ্ছে কথার কথা। আমরা সব সময় বলি। ঐ তো সেদিন আমাদের ক্লাসের মনসুর বলল--সে যদি এক জগ পানি এক চুমুকে খেতে না পারে, তাহলে তার নাম বদলে ফেলবে। আধ জগ খাবার পর চোখটোখ উন্টে এক কান্ড। তার জন্যে তো তার নাম বদলান হয় নি।

কিন্তু অরু আপা সত্যি সত্যি তার মাথার চুল কেটে ফেলল। আমার মা খুব শান্ত ধরনের মহিলা। সহজে রাগটাগ করেন না। তিনি পর্যন্ত রেগে ভূত। জেটিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে বললেন, ‘কেন চুল কাটলি?’

অরু আপা সহজ গলায় বলল, ‘বাজিতে হেরেছি, তাই চুল কাটলাম।’

‘এত সুন্দর চুল কাটিতে একটু মারাত্মক লাগল না?’

‘না, লাগল না।’

‘তুই কি পাগল হয়ে গেলি?’

‘না, হই নি, তবে এখন তোমার চিৎকারে পাগল হব।’

চুল কাটায় অরু আপাকে কী যে বিদ্রী দেখাছিল বলার নয়। তাকে দেখাছিল ছেলেনের মতো। আমার কাছে মনে হল অরু আপা চুল না কাটলেও পারত। আমরা চ্যাম্পিয়ান হয়েছি ঠিকই, কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে বোতল ভূতের জন্যে। সে সাহায্য না করলে সবার সাথে ছ’সাত

গোলে হারতাম। কাজেই এই জেতার ফাঁকি আছে। ফাঁকির খেলার কারণে বেচারী অরু আপার সব ফুল চলে যাবে তা কি ঠিক?

অরু আপা অবশিষ্ট বোতল ভূতের কথা একেবারেই বিশ্বাস করে না। সে সায়েলে পড়ে তো, তাই। সায়েলে পড়লে সব কিছু অবিশ্বাস করতে হয়। সেদিন বাসায় মন্টু ভাই এসেছিলেন। তিনি বই-টাই পড়ে হাত দেখা শিখেছেন। সব সময় তাঁর পকেটে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস থাকে। কেউ যদি হাত দেখাতে চায় ওরি টনি গভীর মুখে বসে যান। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কী সব দেখেটেখে টেনে টেনে বলেন, 'বৃহস্পতির ক্ষেত্রটা ভালো মনে হচ্ছে না। তবে মঙ্গলের ক্ষেত্রে যব চিহ্ন আছে। প্রচুর অর্থ লাভ হবে।'

মন্টু ভাই এমন ভাবে কথা বলেন যে সবাই মুগ্ধ হয়ে যান। অরু মনে হয় তিনি যা বলছেন সবই সত্যি। সেই মন্টু ভাইয়ের ম্যাগনিফাইং গ্লাস অরু আপা একদিন নন্দমায় ফেলে দিয়ে বলল, 'আপনি এইসব অবৈজ্ঞানিক কথা আর বলবেন না তো মন্টু ভাই। খুব রাগ লাগে।'

মন্টু ভাই আহত গলায় বললেন, 'দুই পাতা বিজ্ঞান পড়ে এই কথা বললিস? শেক্সপীয়ার কী বলেছেন জানিস? তিনি বলেছেন--দেয়ার আর মেনি থিংস ইন হেভেন এ্যান্ড আর্থ।'

'তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন না বলে বলেছেন।'

'আর তুই বুঝি বিরাট সাইন্টিস্ট?'

দু' জনে বিরাট তর্ক বেধে গেল। শেষমেশ রাগ করে মন্টু ভাই চলে গেলেন।

অরু আপার স্বভাবই হচ্ছে এই, সবার সঙ্গে তর্ক করবে। কোনো কিছু বিশ্বাস করবে না। চোখের সামনে বোতল ভূতের কান্ডকারখানা দেখেও বলছে ভূত বলে কিছু নেই। এবং সে নাকি তা প্রমাণ করে দিতে পারে। বোতলের ভেতর নাকি আছে শুধু বাতাস।

শেষে রাগ করে একদিন বললাম, 'বেশ প্রমাণ কর যে বোতলে কিছু নেই। তবে তুমি কিছু বোতলের মুখ খুলতে পারবে না।'

'বেশ খুলব না।'

‘প্রমাণটা করবে কীভাবে?’

অরু আপা গভীর হয়ে বলল, ‘খুব সোজা প্রমাণ। ওজন করে প্রমাণ করব। সব জিনিসেরই ওজন আছে। ভূত বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে তারও ওজন থাকবে। এবং যত তার বয়স বাড়বে, ততই তার ওজন বাড়বে। কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে বড় হচ্ছে। আমি যা করব তা হচ্ছে কলেক্টর ল্যাবরেটরির যে ওজনসহ আছে তা নিয়ে বোতলটার ওজন সাত দিন পরপর মাপব। যদি দেখা যায় বোতলটার ওজন বাড়ছে না, তাহলে বুঝতে হবে ভূত-প্রেত কিছু এই বোতলের মধ্যে নেই।’

প্রথম সপ্তাহে ওজন হল সতের দশমিক চার সাত তিন গ্রাম। পরের সপ্তাহে ওজন বাড়ার বদলে খানিকটা কমে গেল। ওজন হল সতের দশমিক চার সাত এক গ্রাম। এর পরের সপ্তাহে হল সতের দশমিক চার ছয় শূন্য গ্রাম। অরু আপনার মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়ার বদলে ওজন কমছে। তা তো হবার নয়। আমি বললাম, ‘ভূতদের বেলার নিয়ম হয়তো অন্য। তারা যতই বড় হয় ততই তাদের ওজন কমে।’

অরু আপা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘বাজে বকিস না।’

‘তাহলে তুমিই বল ওজন কমছে কেন?’

‘ওজন নেবার যন্ত্রটা হয়তো তালো না। এবার অন্য একটা যন্ত্রে ওজন নেব।’

‘বেশ নাও। সাবধান, বোতল যেন না ভাঙে।’

আবার ওজন নেয়া শুরু হল। এবার দেখা গেল ওজন বাড়ছে। অরু আপনার খুব মেজাজ খারাপ। আমি বললাম, ‘ভূতদের ওজন হয়তো বাড়ে, আবার কমে। আবার বাড়ে, তারপর আবার কমে।’

অরু আপা স্বীকৃতি গলায় বলল, ‘বোকার মতো কথা বলিস না তো। বোকার মতো কথা শুনেলে গা ঘুলে যায়।’

‘তুমি তাহলে আমাকে বল, ওজন বাড়ছে কমছে কেন?’

‘কোথাও কোনো তুল করছি, তাই এরকম হচ্ছে।’

‘কী তুল করছ?’

‘সেটাই তো বুঝতে পারছি না।’

অরু আপা আরো কী সব পরীক্ষা করল। বোতল এক সত্তাই অঙ্ককারে রেখে তারপর ওজন। আলোতে রেখে ওজন। কোনোটায় সঙ্গে কোনোটায় মিল নেই। ঝাঁজে রেখে ঠান্ডা করে ওজন নিলে এক রকম ওজন হয়, আবার গরম করলে অন্য রকম ওজন হয়। শেষটায় অরু আপা রাগ করে বলল, ‘তোমার এই বোতল নিয়ে বিদেয় হ। শুধু শুধু সময় নষ্ট।’

অরু আপার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটা লাভ হল। সবাই জেনে গেল বোতল ভুতের ব্যাপারটা। নিতান্ত অপরিচিত লোকও পথের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করে, ‘এই যে বোকা, তোমার কাছে বোতলের ভেতর নাকি কী আছে? দেখি জিনিসটা।’

আমি হাসিমুখে দেখাই। খুব গর্ব বোধ হয়। ভূত পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ান তো খুব সহজ ব্যাপার না। হেড স্যার পর্যন্ত এক দিন বললেন, ‘দেখি জিনিসটা?’

সব ভালো দিকের একটা খারাপ দিকও আছে। একদিন খারাপ দিকটা স্পষ্ট হল। স্কুল থেকে ফিরছি, কালীতলার মন্দিরটার কাছে বগা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বগা ভাই ধমধমে গলায় বলল, ‘বের কর।’

‘কী বের করব?’

‘ভূত বের কর। না বের করলে কানার মধ্যে পুঁতে ফেলব। তুমি আগে এমন একটা চড় দেব যে বক্সিটা দাঁত তো পড়বেই, জিব পর্যন্ত পড়ে যাবে।’

আমি বোতল বের করলাম। বগা ভাই সেই বোতল টপ করে নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বলল, ‘আর কোনো কথা না, সোজা বাড়ি চলে যা। একটা কথা বলেছিস তো ছয় নমুরী খেলাই দিয়ে দেব। ছয় নমুরী খেলাই কাকে বলে জানিস?’

আমি জানতাম না। জানার ইচ্ছাও হল না। বাড়ির দিকে রওনা হলাম। রাগে-দুঃখে আমার চোখে পানি এসে গেছে। পুরুষ মানুষের চোখে পানি আসা খুব খারাপ, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পানি

সামলাতে পারছি না। উপটপ করে পানি পড়ছে।



বোতলভূত হাতছাড়া হওয়ায় আমানের বাড়ির সবাই খুব খুশি। বড়চাচা বললেন, 'বীচা গেল, আপদ বিনায় হয়েছে।' আমার বাবা বললেন, 'এইসব আজীব্যে জিনিস বাড়িতে না থাকাই ভালো।' অরু আপা মুখ বীকা করে বললেন, 'একটা কুসংস্কার বাড়ি থেকে গেছে, এটা একটা সুসংবাদ।'

আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। রাতে ঘুমুতে যাবার আগে রোজ একবার করে বলি, 'ও ভাই বোতল ভূত, ফিরে এস। বগা ভাইয়ের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করার কমতা আমার নেই। তুমি দয়া করে নিজে নিজেই চলে এস।'

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই মনে হয় বোতল ভূত হয়তো নিজে নিজেই চলে এসেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করি, কিছু নেই।

এদিকে বগা ভাইয়ের উপটপ খুব বেড়েছে। রয়েল বেঙ্গল ক্লাবের যাকেই সে দেখে তার কপালে অনেক যন্ত্রণা। এক দিন মুনিরকে ধরে খোলাই নিয়ে গেল। বেচারার জুল থেকে বাড়ি ফিরছিল--বগা ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। বগা ভাই হাত ইশারা করে ডাকল। মুনির না দেখার তান করে চলে যাচ্ছে--বগা ভাই দৌড়ে এসে শার্টের কলার চেপে ধরল। কড়া গলায় বলল, 'কী, চোখে দেখতে পাস না? চড় বেতে কেমন মজা দেখবি? এই দেখ।'

'শুধু শুধু মারছেন কেন?'

'ইচ্ছে হচ্ছে মারছি। মেরে ভর্তা বানিয়ে দেব--আপু ভর্তা।'

এই বলে মুনিরের হাত থেকে অঙ্ক বই টেনে নিয়ে কুচিকুচি করে

হিঁড়ে ফেলল। মূনির কীপতে কীপতে বাড়ি ফিরল।

আমিও এক দিন ধরা পড়লাম। আমার সাথে তোতলা রজু। আমাদের ক্রাসে তিন জন রজু। এদের এক জন শুশু রজু, অন্য দু' জনের এক জন তোতলা রজু, অন্য জন মাখামোটা রজু। মাখামোটা রজুর মাখাটা শরীরের তুলনায় বড় আর তোতলা রজু ভয় পেলে তোতলাতে শুরু করে।

বগা ভাইকে দেখে তার তোতলামি শুরু হয়ে গেল। বগা ভাই বলল, 'তারপর কী খবর?'

আমি পঙ্কীর হয়ে বললাম, 'ভালো খবর।'

'কী রকম ভালো খবর, এখন টের পাবি। কানে ধরে এক শ' বার ওঠবোস কর।'

তোতলা রজু সঙ্গে সঙ্গে ওঠবোস শুরু করল। আমি খীণ স্বরে বললাম, 'কেন?'

'আবার মুখেমুখে কথা? সাহস বেশি হয়ে গেছে? এমন খোলাই দেব যে দুইয়ের ঘরের নামতা ভুলে যাবি। এখন আর সঙ্গে বোতলভূত নেই যে বেঁচে যাবি।'

আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওঠবোস শুরু করলাম। কী দরকার কামেলা করে। কানে ধরে ওঠবোস করতে তো আর খুব কষ্ট হয় না, শুধু একটু লজ্জা।

বগা ভাই বলল, 'বোতলভূত ফেরত চাস? যদি ফেরত চাস তাহলে দু' শ ওঠবোস করতে হবে।'

'দু' শ বার করলে ফেরত দেবে?'

'হঁ। সেই সঙ্গে পঞ্চাশটা টাকা দিতে হবে। নগদ কারবার।'

'টাকা পাব কোথায়?'

'আমি তার কী জানি? টাকা নিয়ে অন্ন, বোতল ফেরত পাবি। এই যজ্ঞগার বোতল ফেরত দিয়ে দেব। ভূত নিয়ে আমার দরকার নেই, আমি নিজেই ভূত।'

পঞ্চাশটা টাকা জোগাড় করতে কী যে কষ্ট হল। রয়েল বেঙ্গল

বগা ভাই উঠে এসে চড় বসিয়ে দিল।

ঘুটলে ক্রবের সবাই টিনা দিল। বড়চাচার কাছে কল্লিকাটি করে
শেষম্ পাঁচ টাকা। বাকি মিলেন মল টাকা। তবু দু' টাকা কম পড়ল।
সেটা আর অর্পা দিতে মিলেন। টাকা পকেটে নিয়ে বোতল ভূত ফেরত
আনতে গেলাম। সঙ্গে মিলাম দুমিরকে।

পোষ্টালিসের সামনের বট গাছের নিচে বগা ভাই তার দুই বন্ধুকে
নিরে আছে। আমি এবং দুনির ভয়েভয়ে উপস্থিত হলাম। বগা ভাই
বলল, 'টাকা এনেছিস?'

'হাঁ।'

'বের কর।'

মিলাম টাকা। বগা ভাই খুব সাবধানে দুবার গুনল। টাকাটা পকেটে
রেখে খয়খয়ে গলায় বলল, 'সঁজিয়ে আছিস কেন, বাড়ি চলে যা।'

'বোতলভূত ফেরত দাও।'

'কথা বললে চড় খাবি। চড় নিয়ে দীও ফেলে দেব।'

'বোতলভূত ফেরত দেবে না, তাহলে টাকা মিলে কেন?'

'এটা হচ্ছে তোমার ভূত পোষার খরচ। যা এখন। একটা কথা বলবি

তো শিয়ালের শিং দেখিয়ে দেব। শিয়ালের শিং কখনো দেখেছিস?'

'টাকা ফেরত নাও।'

'জীয়ে, আবার টাকা ফেরত চায়। শখ তো কম না।'

বগা ভাই উঠে এসে একটা চড় বসিয়ে দিল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। মুনির বলল, 'আমি স্যারদের বলব।'

'যা বলে আর। দাঁড়িয়ে আছিস কেন, যা।'

বলতে বলতে বগা ভাই মুনিরের পেটে একটা ঘুসি দিল। মুনির কৌক করে একটা শব্দ করে পেটে হাত নিয়ে বসে পড়ল।

'দু' জনে এবার গলা জড়াজড়ি করে কানতে থাক। আমরা চললাম।'

আমি এবং মুনির অনেকক্ষণ বসে রইলাম। তারপর বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

দু' জনই কানতে কানতে বাড়ি ফিরছি, তখনি মজার ব্যাপারটা ঘটল। চোখ মোছার রুমালের খোঁজে পকেটে হাত দিতেই হাতে ঠান্ডা কী যেন লাগল। বের করে দেখি বোতলভূত। সে চলে এসেছে।

আমি এবং মুনির দু'জনেই গলা জড়াজড়ি করে অনেকক্ষণ কানলাম। এবারের কান্না সুখের কান্না।



বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ মাস কোনটা?

ডিসেম্বর। পরীক্ষার মাস। এই মাসটা না থাকলে কেমন হত? সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর তারপর জানুয়ারি। মাঝখানের ডিসেম্বরটা নেই। বোতল ভূতকে বললে হয় না? নিশ্চয়ই হয়। সে কিছু একটা করবেই--কিন্তু তাকে বলা যাচ্ছে না। কারণ বড়চাচা 'বোতল ভূত'

ষ্ট্রীলের আলমিরায় বসি করে রেখেছেন। ফাইনাল পরীক্ষার আগে তাকে হাতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। পরীক্ষার পরেও যে পাৰ সে আশাও খুবই ক্ষীণ। এ রকম কেন হল সেটা আগে বলে নিই।

আমাকে আর অধুকে পড়ানর জন্য নতুন এক জন স্যার রাখা হয়েছে, মজিদ স্যার। এই স্যারের চেহারাটা খুব ভালোমানুষের মতো, কিন্তু মেজাজ আগুনের মতো। বাড়িতে ঢুকেই বিনা কারণে একটা হংকার দেন। তারপর বলেন--'হোমটাঙ্কের খাতা আর বেতটা বের কর। কত ধানে কত চাল আগে হিসাব নিয়ে নেই।' আমরা ভয়েতয়ে হোমটাঙ্কের খাতা বের করি। পরবর্তী আধ ঘন্টা আমাদের ওপর নিয়ে বড় ধরনের একটা সাইক্লোন বায়ে যায়। আমরা কান্নাকাটিও করি। তাতে লাভ হয় না। বড়চাচা হুটুটিঙে বলেন, 'ভালো মাস্টার নিয়েছি। এইবার টাইট হচ্ছে। মাস্টার আরো টাইট নাও। আরো।' উৎসাহ পেয়ে মজিদ স্যার আরো টাইট দেন। আমরা চোখে অশ্রুকার দেখি।

শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে অধু যা করল তা মোটেই দেখেই নয়। দু'লাইনের একটা কবিতা লিখল,

'মজিদ স্যার মজিদ স্যার
চোখে দেখি অশ্রুকার।'

কবিতা লিখেই সে থামল না। আমার কাছ থেকে বোতল ভূত কিছুকণের জন্যে ধার করে নিয়ে চলে গেল ছাদে। তারপর খুব করুণ গলায় বোতল ভূতকে বলল, 'ও আমার প্রিয় ভূত, ও আমার নন্দী ভূত, ও আমার ময়না ভূত, তুমি মজিদ স্যারের পা ভাঙার একটা ব্যবস্থা করে দাও ভাই। যাতে সে আর আমাদের পড়াতে আসতে না পারে।'

অধু লক্ষ করে নি যে বড়চাচা ছাদের এক কোণায় সারা পায়ে অলিঙ্গ অয়েল মেখে রোদ তাপাচ্ছেন। সেখান থেকে তিনি য়েবর্জন করলেন, 'অধু এনিকে আর।'

অধু এগিয়ে গেল।

'বোতলটা আমার কাছে দে।'

অবু বোতল নিল।

'কানে ধর।'

অবু কানে ধরল। বড়চাচা বললেন, 'শকুনের বনদোয়ায় গরু মরে না, বুঝলি। যদি মরত--সেপের সব গরু মরে সাক হয়ে যেত। বুঝতে পারলি?'

'বি বুঝতে পারছি।'

'কানে ধরে নীড়িয়ে থাক। আর আমি মজিদ মাষ্টারকে খবর পাঠাচ্ছি সে যেন আজ থেকে দু'বেলা আসে। সকালে একবার, সন্ধ্যায় একবার। যে রোগের যে সাওয়াই।'

মজিদ স্যারকে খবর পাঠাতে হল না। তাঁর বাড়ি থেকে খবর এসে পড়ল--কিছুকণ আগে বাথরুমে পা পিছলে পড়ে তাঁর পা ভেঙে গেছে। বড়চাচা অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। বোতল ভৃত্যকে ষ্টীলের জালমিয়ার তালাবদ্ধ করে রাখলেন। চাবি সব সময় তাঁর কোমরে কালো সুতোয় সঙ্গে বীধা। সেই চাবি হাতে পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই।

অথচ এই মুহুর্তে বোতল ভৃত্যকে আমাদের খুবই দরকার। না, আমাদের পরীক্ষার জন্যে নয়। পরীক্ষা বা হবার হবে। হয়তো ফেল করব। সেটাও ভালো। ফেল করলে রবীন্দ্রনাথ হবার একটা সম্ভাবনা থাকে। বারো সব পরীক্ষার ফাষ্ট সেকেন্ড হয় তারা কবি-সাহিত্যিক হতে পারে না। নিয়ম নেই।

বোতল ভৃত্যটা আমাদের দরকার পাশ-ফেলের জন্যে নয়, অরু আপার জন্যে। অরু আপার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

বড়চাচাই ব্যবস্থা করছেন। তাঁর মতে--মেয়েগুলিকে খুব জাড়াভাড়া বিয়ে দিতে হয়, আর ছেলেগুলোকে দেহিতে। তাহলেই সংসার সুখের হয়। অরু আপার বিয়ে করার মোটেও ইচ্ছা নেই। সে খুব কল্লাকটিও করছে। বড়চাচা বলেছেন, 'কैसे লাভ হবে না। আজ হোক কাল হোক বিয়ে তো করতেই হবে। আজ হলেই কতি কী?'

এক দিন চার-পাঁচ জন ইরা মোটা মোটা মহিলা এসে অরু

আপাকে দেখে গেল। তাদের কী সব প্রশ্ন--

'গান বাজনা জ্ঞান?'

'সেলাই জ্ঞান?'

'রাভা-বাভা কিছু শিখেছ?'

'কোরান শরীফ পড়তে পার?'

'বেতেরের নামাজ কর রাফাত বল তো?'

অরু আপা দিন-রাত কীসে। তার কত ইচ্ছা সে গড়াশেনা শেষ করে জাহাজে করে সারা পৃথিবী ঘুরবে। বেচারীর জন্যে আমাদেরও বুঝ মন খারাপ। অরু আপা চলে গেলে বাড়ি অন্ধকার হয়ে যাবে। আমরা কপাড়া করব কার সাথে? হাসি তামাশাই-বা করব কার সাথে?

শেষটার যেদিন 'পান-চিনি' হবে, সেই দিন কোনো উপায় না দেখে স্টীলের আলমিরার মুখ লাগিয়ে বললাম, 'বোতল ফুট তাই, একটা উপায় কর। কোনো কথা শুনব না। উপায় তোমাকে করতেই হবে। এটা যদি করে নাও, তাহলে আগামী তিন মাস তোমাকে আর বিরক্ত করব না। কথা মিথি। এক সত্যি, দুই সত্যি, তিন সত্যি।'

পান চিনি উপলক্ষে অরু আপাকে সাজান হচ্ছে। সাজাচ্ছেন আমার মেজ মামী। আমরা দূরে বসে দেখছি। কাজল পরানর সময় তিনি হঠাৎ অদাক হয়ে বললেন, 'তোমার চোখগুলি এমন ফোলা ফোলা লাগছে কেন? মনে হচ্ছে ব্যাঙের চোখ।'

অরু আপা উত্তর দিল না। আমরা সেখানাম সত্যি তাই। চোখ দু'টি যেন ঠেলে বের হয়ে আসছে। সাজান শেষ হবার পর সবার চোখ কপালে উঠে গেল। কী কুৎসিত বে দেখাচ্ছে! তাকান যাচ্ছে না। আমার মা বিরক্ত হয়ে মেজ মামীকে বললেন--'এটা কী রকম সাজ হল?' মেজ মামী বললেন, 'কোথার যেন গড়াগোল হয়ে গেছে। অসুবিধা নেই, আবার সাজান হবে।' এবার আরো বিতী হল। মনে হচ্ছে নীল পাড়ি পরে একটা বুড়ো বানির বসে আছে। অথচ অরু আপা পরীর মতো সুন্দর।

তৃতীয়বার সাজানর সময় ছিল না। পাত্রপত্র এসে গেছে। অরু আপাকে তাদের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। তারা ফুট সেবার মতো

চমকে উঠল। এক জন মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

অরু আপা অবিকল বানরদের মতো কিচকিচ করে বলল, 'জাহানারা।' নিজের গলা শুনে সে নিজেই অবাক।

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। বড়চাচা বারান্দায় গম্বীর মুখে বসে রইলেন। একবার শুধু বললেন, 'ব্যাপারটা কী হচ্ছেছে আমি বুঝতে পারছি।'

আমরাও খুব ভালোমতো বুঝতে পারছি। আমাদের অনন্দের সীমা নেই। কারণ বিয়ে ভেঙে গেছে। বরপক্ষের লোকজন চলে গেছে। অরু আপা হাসছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।



এক চৈত্র মাসে 'বোতল ভূত' এনেছিলাম--এখন আরেক চৈত্র মাস। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। কত কান্ড হল 'বোতল ভূত' নিয়ে। সে হয়ে গেল আমাদের সুখ-দুঃখের বন্ধু। কোনো একটা সমস্যা হলেই 'বোতল ভূতের' কাছে যাই। কাতর গলায় সমস্যার কথা বলি--

'ও ভাই বোতল ভূত, লক্ষী সোনা, চাঁদের কথা-- ছয় প্রশ্নমালার তিন নম্বর অঙ্কটা পারছি না। একটু দেখবে, কিছু করা যায় কিনা?'

'ও ভাই বোতল ভূত, আজ ইংরেজি পড়া শেখা হয় নি। তুমি কি দয়া করে ইংরেজি স্যারের অসুখ বানিয়ে দেবে?'

'আজ মগদা পাড়ার বদমাশ ছেলেগুলির সাথে আমাদের একটা মারামারি আছে। তুমি কি দয়া করে আমাদের জিতিয়ে দেবে?'

এই জাতীয় আবেদনে সব সময় যে কাজ হয় তা না, তবে বেশির

ভাগ সময়েই হয়। সাধারণত খুব জটিল সমস্যায় 'বোতলভূত' আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই যেমন অল্প আশার বিয়ে তাঁহার ব্যাপারটাই ধরা যাক না। কেমন চট করে ভেঙে গেল। 'বোতলভূত' হাতের কাছে ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আমি ঠিক করলাম এক বছর পার হলেই বোতলভূতের জন্মদিন করা হবে। বন্ধুবান্ধব সবাইকে বলব। এক টাকা করে চাঁদা ধরা হবে। সন্ধ্যা দিন খুব হৈচৈ করা হবে। আমাদের ক্লাসের মনুকে বলা হবে এই উপলক্ষে একটা কবিতা লেখার জন্যে। মনু হচ্ছে আমাদের ক্লাসের কবি। সে এ পর্যন্ত তিন শ' এগারটা কবিতা লিখেছে। এর মধ্যে কয়েকটা অতি বিখ্যাত। যেমন আমাদের অঙ্ক স্যারকে নিয়ে লেখা কবিতা--"কিঠীবিলা"।

"ঐ আসছে অঙ্ক স্যার
চক্ষে দেখছি অঙ্ককার
হব আমরা পগার পার।।"

গায়কনের গান গাইতে বললে তারা সব সময় বলে-- আজ আমার গলা ভেঙে গেছে, মূত নেই, ইচ্ছা করছে না ইত্যাদি। কবিসের বেলায় তিন্ন ব্যাপার। তাদের কবিতা লিখতে বললেই খাতা-কলম নিয়ে বসে পড়ে। মনুও তাই করল। টিফিন টাইমের মধ্যে হ'পাতার কবিতা লিখে ফেলল। কবিতার শিরোনাম--"ওপো প্রিয় বন্ধু।"

কবিতা শুনে আমরা মুগ্ধ। আমাদের ধারণা হল খয়ং রবীন্দ্রনাথও ছেলেবেলায় এত ভালো কবিতা লেখেন নি। আমরা মনুকে 'মহাকবি' টাইটেল দিয়ে দিলাম। ঘোষণা করে দেয়া হল এখন থেকে মনুকে শুধু মনু বললে কঠিন শাস্তি হবে। মনুকে ডাকতে হবে 'মহাকবি মনু'।

বোতলভূতের জন্মদিনের ব্যাপারেও সবার খুব আগ্রহ দেখা গেল। শুধু আমাদের ক্লাসেরই না, অন্য ক্লাসের ছেলেরাও চাঁদা নিয়ে উপস্থিত। তারাও জন্মদিন করতে চায়। ক্লাশ ফাইভের ছেলেরা এসে বলল, তারা বোতলভূতকে একটা সংবর্ধনা দিতে চায়। ক্লাশ সিক্সের ছেলেরা এসে বলল, তারাও সংবর্ধনা দিতে চায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হল দু'সের

তরফ থেকেই তাকে একটা সংবর্ধনা দেয়া হবে। সেই উপলক্ষে কমিটি তৈরি হল। মানপত্র লেখা হল। মানপত্র লিখলেন ক্রাশ টেনের আবু বকর ভাই। চমৎকার মানপত্র--হে ভূত, হে অশরীরী প্রাণ, হে বোতলবন্দি মুক্তহৃদয়, হে মহাপ্রাণ--এইসব লেখা। পড়লে রক্ত গরম হয়ে যায়।

আমরা ঠিক করলাম বোতলভূতের সংবর্ধনার যার কাছে থেকে ভূত পেয়েছি তাকেই সভাপতি করা হবে। ঐ যে রবি ঠাকুরের মতো দেখতে বুড়োকে। উনি হয়ত আসতে চাইবেন না-- না চাইলেও তাঁকে হাতে-পায়ে ধরে রাজি করাতেই হবে। এক দিন বিকেলে দলবেঁধে পেলাম তার কাছে।

ভীর বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। সব কেমন যেন অন্য রকম লাগছে। বাড়ি রক্ত করা হয়েছে। 'শান্তিনিকেতন' লেখা সাইনবোর্ডটি নেই। সুন্দর একটা বাগান করা হয়েছে বাড়ির সামনে।

ফসামতো এক জন বৃদ্ধ গেঞ্জি গায়ে খুরপি হাতে বাগানে কাজ করছেন। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'উনি কি আছেন?'

বৃদ্ধ হাসি মুখে বললেন, 'উনিটা কে?'

'ঐ যে রবীন্দ্রনাথের মতো দেখতে। লম্বা দাড়ি। লম্বা চুল।'

বৃদ্ধ হেসে ফেললেন। আর তখনি বুঝলাম উনিই সেই লোক। দাড়ি কেটে ফেলেছেন। চুল ছোট করে ফেলেছেন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বৃদ্ধ বললেন-- 'কী ব্যাপার বল তো?'

'ভীর আগে বলুন--আপনিই কি উনি?'

'হ্যাঁ, আমিই সেই মানুষ।'

আমরা বোতলভূতের ব্যাপারটা তাঁকে বললাম। বোতলভূত আমাদের জন্যে কী কী করেছে তাও বললাম। ভীর বিষয়ের সীমা রইল না। তাঁকে দেখে মনে হল এমন অদ্ভুত কথা তিনি ভীর জীবনে শোনেন নি। হতভয় হয়ে যাওয়া স্বরে তিনি বললেন, 'আমিই তোমাকে বোতলভূত নিয়েছি।'

'কি।'

'কী সর্বনাশের কথা! আমি ভূত পাব কোথায় যে তোমাকে

বোতলে ভরে দেব?’

‘এই তো দেখুন না। আমার সঙ্গেই আছে।’

আমি শিশিটা তাঁর হাতে দিলাম। তিনি গভীর অগ্রহে শিশি নেড়ে-
চেড়ে দেখে বললেন, ‘আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে তোমাদের বলি।
আমার মাথার ঠিক ছিল না। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলাম। চিকিৎসা চলছিল।
এখন মনে হচ্ছে মাথা খারাপ অবস্থায় এসব করেছে।’

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

বৃদ্ধ বললেন, ‘তোমরা যে সময়ে জন্মেছ তার অনেক আগেই চাঁদে
মানুষ নেমে গেছে। মঙ্গল গ্রহে নেমেছে ‘মেরিনার-মহাপুণ্যস্থান’। আর
তোমরা কিনা ভূত নিয়ে মাতামাতি করছ। আমার না হয় মাথা খারাপ,
কিন্তু তোমাদের তো আর মাথা খারাপ হয় নি? তোমরা কেন এসব
বিশ্বাস করবে?’

আমি স্বীকৃতি গলায় বললাম, ‘বোতলভূত আমাদের জন্যে অনেক
কিছু করেছে।’

‘কী করেছে?’

আমরা একে একে ভূতের কাণ্ডকারখানা বললাম। বৃদ্ধ মিটিমিটি
হাসতে হাসতে বললেন, ‘এইসব ঘটনা এদ্রিতেও ঘটত। স্বাভাবিক
নিয়মে এ সব ঘটেছে, আর তোমরা ভেবেছ ভূত এসব করেছে।’

আমাদের মন অসন্তব খারাপ হয়ে গেল।

বৃদ্ধ বললেন, ‘মানুষের অসীম কষতা। অসাধ্য কাজের জন্যে
মানুষের ভূতের দরকার হয় না। সে নিজেই পারে।’

এই বৃদ্ধের কথা শুনে আমাদের এতই মন খারাপ হল যে প্রায়
চোখে পানি এসে পড়ার মতো অবস্থা। আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখেই
হয়তোবা বৃদ্ধের মায়্যা হল। তিনি বললেন, ‘তোমরা ভূতের সংবেদনার
আয়োজন করেছে--খুব ভালো কথা। কর। আমি সত্যপতি হিসেবে
সেখানে যাব। অবশ্যই যাব। কিন্তু কথা দিতে হবে, সত্যর গেবে
বোতলটা আমাকে দিয়ে দেবে। কী, কথা দিচ্ছ?’

আমরা চুপ করে রইলাম।

হয়ে বললেন, 'এইখানেই তো ছিল। দেখ তো তোমরা কেউ পকেটে নিয়ে রেখেছ কি না।'

আমাদের কারোরই পকেটে বোতল নেই। আমরা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। নেই নেই নেই। কোথাও নেই।

বৃদ্ধ গভীর গলায় বললেন, 'ভালোই হল। আপদ বিদেয় হয়েছে। যাও, এখন তোমরা বাড়ি যাও। এই জাতীয় বাজে বিষয় নিয়ে আর মাথা ঘামাবে না। কেমন?'

আমরা ফিরে এলাম। ফেরার পথে মনে হল-- আমরা ভূতকে বিশ্বাস করি নি বলে বেচারী বোতলভূত মনের দুঃখেই চলে গেছে। গভীর বেদনায় আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি মনে মনে বললাম, 'ভূত ভাই, তুমি সত্যি হও আর মিথ্যাই হও, আমি সারা জীবন তোমাকে ভালোবাসে মার। তুমি যেখানেই পাবে, ভালো থাক, সুখে থাক।'